KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন. (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪/- ৪/- ৪/- ৪/-	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৬৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ পৌষ, ১৩৬৩ ফাল্গুন, ১৩৬৩
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ ও
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম	লেখক

১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড

৩। Expression & Language of the Unconscious—Sri Sabyasach

৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব—শ্রীসব্যসাচী

৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬। জ্যোতিষী শিক্ষা—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০.০০,

৭। Jyotish Sanchayan

৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints
Answer—Viswanath Deva Sarma

৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী

১০। Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri

১১। লঘুজাতকম্- অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য

১২। বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ ৩য় খণ্ড

১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল ডাঃ রণতোষ সাহা

১৫। ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়

১৮। মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়

১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

ভি পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০.০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অগ্রি

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

: সম্পাদক :

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত :

চতুর্থ বর্ষ কার্তিক ১৩৬৩

ফ্লিট

ঘরের

সব রকম পোকামাকড় ধ্বংস করে

ফ্লিট এমন তীব্র শক্তিশালী তার কারণ এর মসলাগুলো মিলিতভাবে কাজ করে। ছ' রকম কীটনাশক মসলা উপযুক্ত পরিমাণে একসঙ্গে মেশাবার ফলে এতে ঘরের সব রকম পোকামাকড়ই মারা পড়ে। পোকামাকড়ের দরুণ বাড়িতে আর অসুখবিসুখের ভয় থাকে না।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী হওয়ায় ফ্লিট মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু পোকা-মাকড়ের পক্ষে মারাত্মক। লাল, সাদা ও নীলরঙের টিন দেখে আজই ফ্লিট কিনুন।

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী

(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত; কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

V 3357

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ　　কার্তিক　　১৩৬৩

প্রবন্ধ

শিবের গাজন ও গম্ভীরা : কালিপদ লাহিড়ী　৪০১
ছোটগল্প প্রসঙ্গে : শ্যামাপদ সেনগুপ্ত　৪১২
বারট্রাণ্ড রাসেলের সমাজ দর্শন : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত　৪৩২

কবিতা

খোলা জানালায় : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত　৪০৮
সব্যসাচী : কবিতা সিংহ　৪০৯
জয়ন্তীতে : বিবেককুমার রায়　৪১০
তোমার চোখে : বাসুদেব গুপ্ত　৪১১

গল্প

সতীন : আরতি ঠাকুর　৪১৯

উপন্যাস

এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়　৪২৫
পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায়　৪২৯

আলোচনা

সমালোচনা প্রসঙ্গে : নরেন্দ্রকুমার মিত্র　৪৩৫

সমাজসমস্যা

সমাজ-ভিত্তি ও সমস্যা : ব্রজেন্দ্রগোপাল সেনগুপ্ত　৪৩৮

রেডিও-নাটক-সিনেমা

'অপরাজিত'র চিত্ররূপ : বাণী দত্ত　৪৪৩

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান : সিদ্ধার্থ সেন　৪৪৫

গ্রন্থপরিচয়

পথের সন্ধানে (শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) : হীরেন বসু　৪৪৬

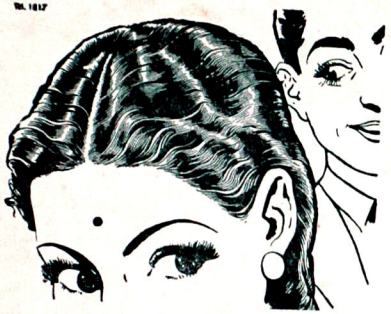

চুল কোঁকড়ানো ক'রে তুলুন

কোঁকড়ানো চুল সবারই প্রশংসা পায়। ঘন, ভারী তেল মেখে চুল চটচটে করবেন না। টমকোর সুগন্ধি কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করুন—এতে চুলের স্বাভাবিক কোঁকড়ানো চেহারাটি খুলবে। বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ এই হালকা তেল তিন রকম গন্ধে পাওয়া যায়—যুঁই, গোলাপ ও ল্যাভেণ্ডার।

প্রায় পঁচিশ বছরের ওপর থেকে ভারতের জনপ্রিয় কেশতৈল

সপ্তাহে একদিন মাথায় টমকো কোকোনাট অয়েল স্যাম্পু মেখে চুল পরিষ্কার করুন—এতে চুল নরম ও কোঁকড়ানো রাখার সুবিধে হয়।

টমকো সুগন্ধি কোকোনাট হেয়ার অয়েল ও শ্যাম্পু

ভারতীয় মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় ভারতবর্ষে তৈরী

টাটা অয়েল মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

ইণ্ডিয়ান সোপ এণ্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স এসোসিয়েশানের সদস্য

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৬৩

শিবের গাজন ও গম্ভীরা

কালিপদ লাহিড়ী

চৈত্র বৈশাখ মাসে শিবের গাজন ও গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। গাজন শব্দ গর্জ্জন শব্দ হ'তে উৎপন্ন, গাজনের আভিধানিক অর্থ শিবের উৎসব। এই গাজনের অঙ্গ প্রধানতঃ ছয় প্রকার,—সন্ন্যাসী নির্বাচন, ক্ষৌরকার্য ও সংযম, ঘটস্থাপন ও হবিষ্য, মহাহবিষ্য, উপবাস উৎসব ও নীলাবতী পূজা, চড়ক (উৎসব শেষ)

উৎকল, মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর ও ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মপুরাণে এই প্রকার উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। রামাই পণ্ডিতের ধর্মের গাজন নামক পূজার প্রচলন ও পুস্তক প্রচার গৌড়বঙ্গে শিবের গাজন বা গম্ভীরার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করেছে। ধর্মপূজা পদ্ধতি বা শূন্যপুরাণে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাহাই গাজন বা গম্ভীরার নির্দিষ্ট বিধি বলে প্রচলিত। মাণিকদত্তের চণ্ডী এবং ধর্মপূজা পদ্ধতি নামক গ্রন্থেও এ প্রকার উৎসবের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন, বিপ্রদাসের পদ্মার গীত ও ধর্মমঙ্গলে ধর্মের গাজন ও গম্ভীরার অনুরূপ শিবের গাজনের বিশদ বিবরণ আছে। আদ্যাদেবীর সপ্তজন্ম গ্রহণের পর শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রেছিলেন। ধর্মপূজা পদ্ধতি নামক পুস্তকে আদ্যার বিবাহ শিবের সহিত হয়েছে, এ বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ আদ্যাচণ্ডিকা দুর্গারূপে মহেশের বামে বসলেন হরগৌরীরূপে। এই সময় হতেই শিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হয়। 'হীনযান' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের যে পূজা উৎসব করত, তা থেকেই কালক্রমে গম্ভীরার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। শ্রীহর্ষদেবের সময় ধর্মসমন্বয়ের যুগ। তাঁহার কান্যকুব্জের চৈত্রোৎসব হতেই যে শিবের গাজন বা গম্ভীরার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। গুপ্ত বংশীয় নরপতি শশাঙ্ক শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর সময় গৌড়বংগের রাজন্যবর্গ শৈব ও শক্তি মূলক তান্ত্রিক ধর্ম রাজধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীহর্ষদেবও মহাযান ধর্মমূলক মন্ত্রযান মতের অনুবর্তী হ'লেন। এই বর্দ্ধনবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে আবার কেহ শৈব, কেহ সৌর এবং কেহ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পুষ্পভূতি নামক বর্দ্ধনবংশীয় নরপতি বাল্যকাল হতে শিব আরাধনা করতেন বলে জানা যায়।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মতে পালরাজগণের সময় ধর্মের গাজন নামে যে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান হত তার প্রত্যেকটি আধুনিক গম্ভীরা বা গাজনে বিদ্যমান আছে। বল্লাল সেনের সময় যখন নূতন হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছিল, তখন বৌদ্ধদের ধর্মের গাজন বা গম্ভীরা হিন্দুদের আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসব মধ্যে পরিগণিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হতেই শৈব শক্তির উৎসবের প্রাবল্য দেখা যায়। এই সময় বৌদ্ধদের মহাযান ও হিন্দুদের শৈবধর্ম তান্ত্রিক দেবতাদের যে পূজা উৎসব প্রবর্ত্তন করে তা থেকেই শিবের গাজন বা গম্ভীরা ক্রমবিকাশ লাভ করে। এই সময় থেকেই বৌদ্ধ উৎসবগুলি হিন্দুধর্ম অভিমুখী হতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে হিন্দু উৎসব মধ্যে পরিগণিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মালদহের গম্ভীরা অতি প্রাচীন উৎসব এই উৎসবে, শিবের পূজাই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই পূজা উপলক্ষ করেই উৎসবের আয়োজন। বিভিন্ন জাতি সমন্বয়ে গঠিত বাঙ্গালী জাতির নানা ধর্মানুষ্ঠানে শিবভক্তির প্রাচুর্য্য প্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালী জাতির মনের উপর শৈব শক্তির প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে। গম্ভীরা গান—এই শিবেরই স্তুতির গান, এই শিবকে উপলক্ষ্য করেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুখ দুঃখ মোচন কাজে তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাই। গম্ভীরা গানকে জানতে হলে মালদহের ইতিহাসকে না জানলে চলে না। 'আদ্যের গম্ভীরা' প্রণেতা ঐতিহাসিক হরিদাস পালিত মহাশয়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করা হল। তিনি বলেছেন, "গম্ভীরার ভাবলহরীই আমাকে মালদহের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। গম্ভীরার ইতিহাস খুঁজিতে গিয়াই গৌড় ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন দৃশ্যগুলি একে একে আমার মানস নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। গম্ভীরা আমার নিকট যতই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমি ততই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাচীন কাহিনীর গান শুনিতে পাইয়াছি।" স্বর্গীয় বিনয়কুমার সরকার মহাশয় গম্ভীরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—গম্ভীরা যে কেবল এক এক পাড়ায় তিনদিন আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালীর আদর্শ গঠন করবার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।" গম্ভীরা মুখ্যতঃ হিন্দুধর্মের একটা অনুষ্ঠান হ'লেও গম্ভীরার সাহায্যে এই জেলার শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, লোকমত ও শিক্ষা প্রণালী সবই গড়ে উঠেছে। এ সকল বিষয়ে জাতিভেদ, ধর্মভেদ বা সম্প্রদায় ভেদের স্থান নাই। সুতরাং এটা একটা সার্বজনীন উৎসব। জাতিগত, ধর্মগত, পার্থক্য ভুলে একইভাবে, একই গৌরব ও আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে ভ্রাতৃভাবে মিলিবার মহামিলন ক্ষেত্র এই গম্ভীরা মণ্ডপ। বসন্তের বাসন্তীপূজা সমাপন করে লোকে চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখে এই নববর্ষোৎসবকে বরণ ক'রে ভ্রাতা ভগিনীর মিলিত আহ্বানে দেবতা চরণে নববর্ষের কল্যাণ ও শান্তির প্রার্থনা জানায়।

শিবের অপর নাম 'গম্ভীর' এবং এই গম্ভীর শব্দ থেকেই গম্ভীরা শব্দের উৎপত্তি। গোবিন্দ চন্দের গীতে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামের বাবা ঈশানেশ্বর দেবের গাজনেও বৈষ্ণব

ধর্মগ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃততে গম্ভীরা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। গম্ভীরা উৎসবে অনুষ্ঠিত 'কণ্টক শয্যা' ও 'বাণফোঁড়া' প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির নিদর্শন ধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে।

কেহ কণ্টক শয্যায় শুইয়া ধর্ম্ম-ধিয়ায়
কেহ বাণে করে অঙ্গ ক্ষত।
কেহ খড়্গ শয্যা করে ভাবে ধর্ম্ম অবতারে
এইরূপে সেবে ভক্ত্যা যত॥ (ধর্ম্মপুরাণ)।

গাজনের সন্ন্যাসীর ক্ষৌর কার্য্য, সংযম এবং গম্ভীরার শিব ভক্তদের সংযম, হবিষ্য প্রভৃতি কার্য্যবিধি একই সূত্রে গাঁথা। তাছাড়া শিবের গাজন, চড়ক পূজা, নীলের পূজা প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একই শিবেরই প্রভাব বিদ্যমান। মালদহের গম্ভীরাও শিবের উৎসব, শিবের পুজানুষ্ঠান। মহাভারত, বেদ, পুরাণ, মঙ্গলচণ্ডী, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন, বিপ্রদাসের পদ্মার গীত, ধর্ম্মমঙ্গল, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং তিব্বতীয় সাহিত্য প্রভৃতিতে এইরূপ অনুষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশেও এপ্রকার উৎসবের পরিচয় আছে।

উৎকলের সাহীযাত্রা, চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ উৎসব, গ্রীসদেশের 'ফেলিফোরিয়া' উৎসব, মিশর দেশের 'আসীরিস্' দেবতা ও বৃষবাহনের উৎসব এবং তিব্বত ও ব্যাবিলনের উৎসব আর জৈনদের 'ঋষভে'র জন্ম মহোৎসব প্রভৃতি উৎসবের সঙ্গে গাজন বা গম্ভীরার অনেক সাদৃশ্য আছে। বৈদিককাল হতে ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা চলে আসছে। গম্ভীরা মণ্ডপে শিবের সম্মুখে নৃত্যাদি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পুরাণ উপপুরাণ ও সংহিতা গ্রন্থে নৃত্যগীত ও বাদ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং গম্ভীরা যে অতিপ্রাচীন এ বিষয়ে ভিন্ন মত নাই।

গম্ভীরা গানের রচয়িতা গ্রাম্যকবি হইলেও তাহাদের রচনায় নৈপুণ্য ও ভাব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল,—"ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা কৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীত কর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়"। রচনা নৈপুণ্যে ও অপরূপ ছন্দে গ্রথিত এই গানটিতে নিরক্ষর গ্রাম্য কবির কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ব্যাটারে!) করিস্ না আর কাটাকাপ্
লক্ করয়া থাক্।
দেণ্যা শুন্যা দিব বিহা
লাগিয়ে দিব চাঁদের হাট,
লক্ করয়া থাক্। ইত্যাদি

কাটা কাপ অর্থ অভিমান, লক্ অর্থ চুপ এবং বিহা অর্থ বিবাহ। হাস্য-রসাত্মক গান গুলি মালদহের নিজস্ব সুরে ও নিজস্ব গ্রাম্য ভাষায় লোকায়ত করে রচিত। তা ছাড়া রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গান ত প্রচুর আছে। এ স্থানে উহার কয়েকটি

দেওয়া হ'ল। ভক্তিভাব সমন্বিত একটি প্রাচীন গানে বাক্যবিন্যাস ও উচ্চভাব লক্ষ্য করবার বিষয়।

তুমি এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ বড়ই ভালো জানো,
ব্রহ্মাণ্ডের একদিক হ'তে ফেলে মাকু আর দিকেতে টানো।
সৃষ্টি করে মায়ার নরদ, তাহে জড়িয়ে দারা, পুত্র, গরদ,
ঝাঁপ উঠায়ে পরদ পরদ আচ্ছা বুনান বুনো।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করা, তোমার পক্ষে মশরা জড়া,
পাপীগণকে পেলাম করা কাজে, ধুতরা ধুনো।
এমনি তুমি তাঁতের তাঁতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সাথের সাথী,
ফুলকী বাছ পাঁতিপাঁতি, মৃত্যু দপ্তি হানো।
তোমার আত্মাশক্তি চরখা লাটা, ত্রিগুণ সুতা কাটনা কাটা,
৺হরিমোহন বলে তানা হাঁটা, এতই করাও কেন ?

(৺হরিমোহন কুণ্ডু)

রঙ্গ ব্যঙ্গের সাহায্যে সমাজের ও রাষ্ট্রের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করারও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনিই এই গানের মাধ্যমে আমোদ প্রমোদ পরিবেশনেরও একটা সার্থকতা আছে। এটাও একটা আর্ট। এ বিষয়ে কাব্য ও সংগীতে যেমন সমন্বয় সাধন দরকার, তেমনই দরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর। ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মূলে এ জাতির আত্মবীর্য্যের পরম মাহাত্ম্য বিভিন্ন ধারায় এবং বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত। এ বিষয়ে গম্ভীরা গানের অবদান অনস্বীকার্য।

জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল এই গম্ভীরা গান—হাস্য রসের মাধ্যমে,—

স্বরাজ যদি পাইছে ভোলা,
খেতে দিব মাণিক কলা, নইলে আঁঠ্যার কলা।

• • •

বানিয়া হ'ল দেশপতি
কি বলব ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিয়ে খোলা।
কি বলব হে ভোলা নানা,
বুক ফুটে ত মুখ ফুটে না
এ মুখ ফুটাও ভাতের মত
উঠাও বণিকের ঝোলা।
মনোরঞ্জন বলে করজোড়ে

ক্ষমা কর শ্রোতা মোরে
উচিৎ কথায় চটে সবাই,
রক্ষা কর ভোলা। (৺মনোরঞ্জন দাস)।

এখানে বেণিয়া অর্থে ইংরাজ বণিক বলা হয়েছে।

মনু বলেছেন, অপত্য বিক্রয় করলে পতিত হ'তে হয়।—

কন্যায়াশ্চেৎ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্ক মণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী ॥

পণ প্রথা দেশের ও সমাজের অমঙ্গলজনক, গ্রাম্যকবি তারই পরিচয় দিয়েছেন পিতা ও কন্যার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।—

পিতা—মা! তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে।
অমন শিক্ষাতে ধিক্ অন্ধ অধিক বেচে যেন শালিক টিয়ে।
কন্যা—সোণার চেন, সোনার ঘড়ি গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনোনা বাবা দিয়ে টাকা কড়ি,
বিহা কি পদার্থ, অ পদার্থ বুঝে না ছেলে পেয়ে।
পিতা—ভণ্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই শোষে রক্ত বেশী
বি এ, এম এ, হলে ছেলে, হয় অর্থ পিয়াসী
ধিক্ উচ্চ শিক্ষা, স্বদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।
কন্যা—বাবা! স্নেহলতার মত না হয় করব জহর ব্রত
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে করব জীবন হত,
না হয় ভজব পশুপতি, ঘুচাব দুর্গতি ;
পূজব উমার মত হয়ে।
পিতা—কি কুক্ষণে আদিশূর আনল দেশে এই অসুর
বল্লালের চোখে নুন দিয়ে মারতে কেন কল্ল কসুর ;
মেয়ের বাপ দুম্বা, মেষ, এ পোড়া বাংলা দেশ,
নিত্তি খাচ্ছে মাংস কেটে নিয়ে ইত্যাদি।

অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশের দুষ্ট গ্রহ এবং একতার পরিপন্থী। জাতীয় জীবনেও সমাজের কল্যাণের জন্য অস্পৃশ্যতা বর্জন অত্যাবশ্যক। শ্রীগোবিন্দলাল শেঠ কর্তৃক রচিত গানে শ্যামা মায়ের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে সেই দুঃখই জানান হয়েছে।—

তুই বুঝি শ্যামা ন'স্ মোদের মা
নই মোরা তোর ছেলে।
নইলে এমন ক'রে রাখিস্ দূরে
ফেলিস্ পায়ে ঠেলে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যত উচ্চ জাতি
তারাই মা তোদের সন্তান সন্ততি
মোরা অতি জঘন্য অস্পৃশ্য ঘৃণ্য
জাত যায় মোদের ছুলে।
ভাবি বুঝি পূর্ব জনমের করম
যার ফলে ছোট জাতের জনম,
আজীবন মোরা রইলাম অধম
চিনলে না কেউ মানুষ ব'লে।
জগন্মাতা তুই, তোর সবাই সন্তান
মায়ের স্নেহ সবার প্রতি সমান,
(তবে) মোদের প্রতি মা কেন ব্যবধান
আমরা কি তোর সৎছেলে।
মৃন্ময়ী মা! করি প্রণাম
করিস সন্তানেরে আশীষ দান,
শুধু রইল এই খেদ তোর স্নেহে প্রভেদ
স্থান নাই মোদের তোর কোলে।

বিলাসীতা ও চাকুরীর মোহ সম্বন্ধে সমাজ চেতনা বিষয়ক গ্রাম্য কবির গান নিয়ে উদ্ধৃত করা হ'ল। সামাজিক সংস্কৃতির দিক দিয়ে এরূপ সংগীত প্রচারের আবশ্যক যথেষ্ট আছে, তা ছাড়া লোক শিক্ষার দিক দিয়েও এটি মালদহের নিজস্ব সম্পদ।

আমরা বিলাসীতায় বাংলাকে হায়
মাটি করলাম ভাইরে।
আমরা ছিলাম বা কি, হলাম বা কি
বাকী কিছুই নাইরে।
আমরা দুপাতা ইংরেজী পড়ে,
কৃষি কর্ম তুচ্ছ করে
বাপ দাদার ব্যবসা ছেড়ে
পরের মুখ পানে চাইরে। ইত্যাদি (মহম্মদ সুফী)
বাবু! ধনে প্রাণে সবাক মারিলি হে
তোরাই এদেশটাকে সারলি।
দুঃখের গাদায় মোদের গারলি।
কামার, কুমার, ছুতার, শাঁখারি, মালাকার
বিদ্যা শিখে ধরলে চাকুরী হে;

যা কিছু আছে মুখের কাছে,
তাকেও পরিষ্কার না করলি;
আগে মোদের দেশে,
কত শিল্পী এসে
শিখে গেছে শিল্প বিদ্যা হে,
তাজমহল, মিনার, গৌড়, আদিনা
দেখেও পরের রূপে ভুলিলি। ইত্যাদি—
(৺গোপালচন্দ্র দাস)।

গম্ভীরা গান আরম্ভ হয় শিবের বন্দনা গান দিয়ে। শিবের বন্দনা অর্থাৎ স্তব বা স্তুতি গানের মধ্যেও রচনা নৈপুণ্য ও কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানে শিবের বর্ণনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।—

ঐ স্থাথ্ ন্যাংটা বুড়া সংটা সাজ্যা।
ঢংটা করা আছে বস্তা।
বুড়া আস্ত খ্যাপা ভষম ল্যাপা।
বাঘের ছালটা পড়ছে খস্যা।
(সতীশ চন্দ্র গুপ্ত)

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর।
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব পুর।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুকুমার, বীজ বুনানী মজুর তোমার,
কতই যে বীজ হয়না সুমার ওহে গঙ্গাধর।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে, কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে,
মায়া রজ্জু নাসায় ছেঁদে, কতই যে আর তাড়।
সুখ দুঃখ দুই শক্ত যোতা, সেই জোয়ালে আছে যোতা
পিছনে আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা, ওহে দিগম্বর।

খোলা জানালায়

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

একফালি সরুপথ কাঁটাঝোপ বনের আড়ালে
—ঝিকিমিকি ক্ষীণশিখা মিটিমিটি চায়।
কেউ যদি অন্যমনা সেই পথে পাদু'টি বাড়ায়
শত শাখা-প্রশাখার ছায়া-আব্‌ডালে
দেখা যাবে মুখ এক খোলা জানালায়।

যখন ভোরের রোদ মিহিভাঁজ কুয়াসা সরিয়ে
জানালা-কপাটে থাকে আঁকা,
হাওয়াময় সেই পথ দিয়ে—
কাঁটাঝোপে বাঁকা,
শতকাজে হাঁটি
চোখে পড়ে মুখ একখানি,
খোলাপাখি, ছোটো জানালাটি।

সেই মুখ লালচে আভাসে
কবরীর রেশমের ফাঁকে
সততই হাসে।
চুয়ানো রোদের ফোঁটা ঠিকরায় ঘাসে।
চ'লে যেতে উষাকালে, ধূসর বেলায়
সেই মুখ—ছবি যেন চোখে পড়ে যায়
ছোটো এক খোলা জানালায়।

আমাদেরও এ হৃদয় কোনো ছোটোখাটো
নয় কি জানালা?
যেখানে রোদের মত রং থাকে জ্বালা
ভাঁজখোলা পাখি,
সেইখানে কোনো এক সোনা-জ্বলা মুখ
দীপ জ্বালে নাকি?

একদিন কোনো ছলে পাখি বুজে গেলে
সেই মুখ তবু দেখা যায়
হৃদয়ের খোলা জানালায়।

সব্যসাচী

কবিতা সিংহ

জননী আমার চন্দ্রা বন্যাশবরী
গানের দেবতা সূর্য্য আমার পিতা
ধনুক—সেতার দুই বিদ্যার খবরই
সমান জেনেছি সেই জন্যেই মিতা

তূনীরে সুন্দর উৎসারিত হয়—
ধনুকে যদি দিই টংকার—
সুরের নভ চারী বাতাসে ডানা মেলে
বীনার তারে তুলি ঝংকার!

আমি তাই শিকার করি
সে হাতেই সেতার ধরি।*

* একটি আমেরিকান কবিতার অনুবাদ

জয়ন্তীতে

বিবেককুমার রায়

এখানে গর্জন, আর বন্দরে ওঠে ও নামে ক্রেণ,
ঝক্‌ঝকে চাকা চলে, স্বর্ণে ও মুদ্রায় লেনদেন
এ ঘাটে ও ঘাটে জমে, ফার্ণেস লাল টকটকে,
শতাব্দীর দৃষ্টি বুঝি ঢেকে থাকে তার সে আলোকে।

হঠাৎ এ কলিকাতা, রোম আর টোকিও অবাক,
শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু হ'তে আসে একখানি ডাক,
বহু যুগ পার হ'য়ে বাঁশার মতন বেজে যায়,
শতাব্দীর লোকগুলো নীরবে এ ওর দিকে চায়।

পথ কি হ'য়েছে ভুল! চেয়েছিলো আকাশের চাঁদ,
সে সাধ তো বিদ্যুতেই মিটিয়ে সে ছিলো নির্বিবাদ;
আলাতে প্রদীপশিখা জ্বেলেছে হাজারশক্তি বাতি;
রামকেলী বাজাতে সে ট্রাম্পেটে বাজালো প্রভাতী!

ভুল আর এলোমেলো হ'ল যেন যেটা ছিলো ঠিক,
কি এক পথের যেন কবে এক তরুণ পথিক
বাঁশীর সুরের মতো ডাক দিলো,—অহিংসা ও প্রেম
দিশারী আলোর মতো দু'চোখে কি আমরা পেলেম:

অক্রোধে ক্রোধকে জয়, ক্ষমার নির্মলজয় গাঁথা
আজ ফের শোনে রোম, টোকিও, এথেন্স, কলিকাতা;
প্রেম আর মৈত্রী, ক্ষমা, অম্লান করুণাময় বাণী
কল্যাণমধুর হ'য়ে ডাকে ফের কি জানি, কি জানি॥

তোমার চোখে

বাসুদেব গুপ্ত

তোমার চোখের স্বপ্ন-সজলে
একটি ছন্দ নাচে;
ভীরু ভীরু হাওয়া লাজুক আঁচলে
ফিরে ফিরে আসে কাছে॥
...গান হ'ল সুরগুলি
মিহি ভাবনার মুখে;
গোলাপী দিনের তুলি,—
তপ্ত আমার বুকে!
তোমার বুকের সপ্ত দোলায়
মুগ্ধ মেঘের গতি;
ঝুরু ঝুরু দিন গীতালী বাজায়,
সাজায় আনত নতি॥
...কি যেন কি কথা খুঁজি:
হারাই হারাই বুঝি;
কে যেন কি কথা ক'বে,—
মুকুলিত অনুভবে!
তোমার চলার মৃদু নিঃস্বনে
তারা-নিঃঝুম রাতি:
মিটি মিটি চায় আলো আভরণে,
দেখায় চাঁদের বাতি॥
.....
একঝাঁক ছায়া নামে:
ঘুম ঘুম ক্ষণে ক্ষণে;
একটি ভ্রমর থামে,
একটি পদ্মবনে!!

ছোটগল্প প্রসঙ্গে

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

অধুনা সাহিত্যে ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট স্থান করেছে। ছোটগল্পের আঙ্গিক সাহিত্যের অন্যান্য শাখা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে এখানে উপন্যাস ও নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ছোটগল্প উপন্যাসও নয় এবং নাটকও নয়, আবার ছোটগল্পে উপন্যাসের লক্ষণও থাকে বিশেষতঃ প্রবহমানতার দিক থেকে ছোটগল্প নাটকের সাথে তুলিত হ'তে পারে।

বর্তমান জীবনের নানা ভাঙ্গা অবহেলিত ও তুচ্ছ কাহিনী ছোটগল্পের মাধ্যমে বিধৃত হচ্ছে। যে সব কাহিনী আমাদের মনে এক নতুন আবেদন ও রস এনে দিচ্ছে। এই সব আবেদন যে শিল্পী আমাদের সামনে কথা দিয়ে উপস্থাপিত করছেন, তারা নিশ্চয়ই জীবনের তুচ্ছ কাহিনীর মাঝে একটা প্রবহমানতা দেখেছেন। ঘটনার প্রবাহের সাথে দেশ, কাল ও পাত্র জড়িত। এই প্রবহমানতা হচ্ছে ছোটগল্পের প্রাণ, নাটকের যেমন action—ছোটগল্পের তেমন প্রবহমানতা। রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প তাই বোধ হয় পাঠক এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে। নাটকের আঙ্গিকের সাথে ছোটগল্পের মিল এইখানেই। নাটকের যেমন speed, তেমনি ছোটগল্পের প্রবহমানতা। তবু ছোটগল্প নাটক নয়, ছোটগল্পে শিল্পী উপস্থিত থাকেন। পাত্র এবং পাত্রীর মনোবিকলনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উপর শিল্পী মন্তব্য করেন। নাটকে শিল্পী অনুপস্থিত শিল্প হচ্ছে তার নাটক; নাট্যকার নৈর্ব্যক্তিক, নাটকারকে শিল্পের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না খণ্ডভাবে। নাটকের সমগ্র সত্তায় অলক্ষ্যভাবে শিল্পী মিশে থাকেন বা আত্মলীন হয়ে হারিয়ে যান। তা ছাড়া 'সময়' হচ্ছে নাটকের প্রাণ। সময় বা কাল নাটকে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আঙ্গিক। সংক্ষিপ্ত সময়ের সীমার মাঝে নাটক শেষ করতে হয়। ছোটগল্পে সময় সীমার কোন নির্দেশ নাই। তাই জন্য প্রায়শঃ ছোটগল্প 'flash back' আঙ্গিকে লেখা হয়। নাটকে Flash back সাধারণতঃ scene এবং action-এর মারফত বর্ণিত হয় না। কথায় সারতে হয়। ফলে নাটকের 'নাটকীয়' ঘটনাগুলো বর্ণনামূলক হ'য়ে পড়ে। অর্থাৎ নাট্যকারকে narrative ঘটনাগুলো নেপথ্যে রেখে শুধু পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে সেগুলি বলিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ফলে সেগুলি নীরস প্রবাহহীন স্বগত উক্তির সামিল হ'য়ে পড়ে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি কোন কিছু নেপথ্যে ঘটিয়ে চরিত্রচিত্রণের বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাহিনীর পাত্রপাত্রীকে Scene এবং action-এর মারফত পাঠক মনের পাদপ্রদীপে তুলে ধরেছেন তিনি। তা ছাড়া নাটকের সাথে ছোট গল্পের পার্থক্য আছে। নাটক অভিনীত হওয়ার অপেক্ষা রাখে—সে নাটিকাই হোক অথবা পঞ্চম অঙ্কের নাটক হোক। নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নাট্যরস উপভোগ করতে হলে অভিনয় দেখা প্রয়োজন। ছোট গল্প পড়েই খালাস।

তা হলেও নাটকের সঙ্গে ছোট গল্পের আরও সাদৃশ্য আছে। নাটকে action থাকবেই।

সেই action হচ্ছে Single, Whole এবং Complete, ছোট গল্প সাধারণতঃ এক ব্যক্তিমানসকে উপজীব্য ক'রে লেখা হয়। পার্শ্ব চরিত্র অবশ্য রেখাঙ্কন করতে হয় মূল চরিত্রকে পরিস্ফুট করবার জন্য। তা ছাড়া এক ব্যক্তি মানসকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্র সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠলেও কোন এক বিশিষ্ট mood বা imageকে ছোটগল্প সাধারণতঃ ফুটিয়ে তোলে। এই বিশিষ্ট mood বা imageকে একটী বিশিষ্ট রূপ দিতে হলে চাই শিল্পীর মননশীলতা। এই মননশীলতাই ছোট গল্পের প্রাণ। নাটকের যেমন action ছোট গল্পের সেই রকম মননশীলতা। মননশীলতার অভাবে ছোট গল্প নিজের দার্ঢ্য হারিয়ে ফেলে—যেমন নাটক খেই হারিয়ে ফেলে actionর অভাবে।

এই মননশীলতা ধরা পড়ে ঘটনার মাধ্যমে—ঘটনার মালা গেঁথে পাত্রপাত্রীকে একটা স্বচ্ছ প্রবহমানতার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে এক একক জীবনের রূপকে পরিস্ফুট করাই ছোট গল্পের কাজ।

এই একক রূপই ছোট গল্পের এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ রূপ। ছোট গল্পের বাঁধুনি বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো হলে চলবে না। একটা জমাট ঘনপিনদ্ধ আখ্যানবস্তুই ছোট গল্পের প্রাণ। জীবনের একটী প্রতিফলন যখন সমগ্রভাবে সার্বিক হ'য়ে ধরা পড়ে তখনই ছোটগল্প একক রূপে রূপায়িত হয়। এই জন্য ছোট গল্পকে চোরা লণ্ঠনের সাথে তুলিত করা হয়েছে। চোরা লণ্ঠনের আলোর বিচ্ছুরণ আঁধারে বিকীরিত হচ্ছে বটে কিন্তু সেই আলোর বিচ্ছুরণ আঁধারকে দূর করতে পারেনি তবুও অকম্প শিখা নিজের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। আলোক শিখা দেদীপ্যমান এবং সেই শিখা আঁধারের রহস্যের মাঝে আপন প্রভায় উদ্ভাসিত। সকলেই সে শিখাকে দেখতে পাচ্ছে। জীবনের বিরাট বিস্তৃতি ছোট গল্পে জানা যায় না। কিন্তু বিরাট বিস্তৃতির অজ্ঞাত জীবনবোধ না জানা থাকলেও একক আলোর সঞ্চারিত শিখা ছোটগল্পের মাঝে বিকীর্ণ হতে থাকে। ছোট গল্প বিরাট জীবনের একটী বোধকে সমগ্রভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণতার মাঝে প্রকাশ করে থাকে। ছোট গল্পের এইখানে সার্থকতা। আলোক শিখা সমুজ্জ্বল হয়ে যেমন আঁধার দূর করতে পারে না—তেমনি ছোটগল্প জীবনের এক একক রূপকে রূপায়িত করেও অন্যরূপকে আলোকিত করতে পারে না। একটা ক্ষুদ্র বোধকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করে তোলাই ছোট গল্পের কাজ। অবশ্য অনেক ছোট গল্প এই সীমাকে লঙ্ঘন করেছে, সেখানে ছোটগল্পে থাকে উপন্যাসের অঙ্কুর। অনেক ছোট গল্প উপন্যাসের আকারে অঙ্কুরিত হয়েছে, কিন্তু সে ছোট গল্প পূর্ণ উপন্যাসে অর্থাৎ ফল, ফুল ও পল্লবে পল্লবিত হয় নি।

ছোট গল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য: ছোট গল্পকে চোরা লণ্ঠন বলা হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী হচ্ছে অন্য রকম। সমাজের এক কোণ থেকে ঔপন্যাসিক দৃষ্টি ফেলেন। সেই আলোর একক বিচ্ছুরণ বর্ণালীর মাঝে ধরা পড়ে একাধিকভাবে প্রতিফলিত হয় জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে। চোরা লণ্ঠনের আলো কিন্তু বর্ণালীর ছটার মত প্রতিফলিত হয় না বিভিন্নভাবে। উপন্যাসে সমাজের পরিপ্রেক্ষিত জীবনের প্রশ্ন দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলো বর্ণালীর ছটায় পড়ে—বহুধা ভাবে বিভক্ত হ'য়ে।

এই কথাটা এই রকম ভাবেও বলা যেতে পারে। কিন্তু স্থির জলে যদি কেউ ঢিল ছোঁড়ে তা হলে ঢিলের আঘাতে জল অনেকগুলি তরঙ্গ সৃষ্টি করে সেই জলাশয়ে—একটা ঢিলের আঘাতে সংস্র সংস্র তরঙ্গ ক্রমশঃ কেন্দ্র হতে সেই জলাশয়ের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে তরঙ্গগুলো ক্ষুদ্র ভাবে ক্ষিপ্ত হয়—তারপর ক্রমশঃ বৃহৎ হতে বৃহত্তরভাবে তটের সীমানায় এসে পৌছোয়। উপন্যাসের ব্যঞ্জনা ঠিক এই তরঙ্গের মতন। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী বা ঘটনার মারফতে উপন্যাস আমাদের মনের কেন্দ্র হতে উদ্ভূত হয়ে চারিদিক নাড়া দেয়। ক্ষুদ্রদেশ, কাল ও পাত্র ঔপন্যাসিকের লেখনী স্পর্শে চিরন্তন হ'য়ে ওঠে। জীবনের বহুবিধ সমস্যাকে এক গ্রন্থি বন্ধনের মাঝে এনে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা খুব সহজ কাজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ধুরন্ধর ঔপন্যাসিক ছোট গল্প লিখতে পারেননি এবং গল্পকাররা উপন্যাস বলে যা লিখেছেন তা মূলতঃ গল্পই। সমাজের সর্বস্তরের সম্যক জ্ঞান না থাকলে ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না; এর সাথে মানবিক জীবনবোধের বহু জটীল প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনের একটী খণ্ড স্তরকে কেন্দ্র করে গল্পের আখ্যানবস্তু গড়ে ওঠে।

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে ছোট গল্পকে কেউ গীতিকবিতার পর্য্যায়ে এনেছেন। গীতি কবিতায় একটা মূল সুর থাকে। গীতিকবিতায় উচ্ছল প্রবণতা আছে। একটী বিশিষ্ট মুড বা ইমেজ আত্মলীন অবস্থায় গীতিকবিতাতে বিরাজ করে। গীতিকবিতায় সুর, ভাষা ও ছন্দ একটী একক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। সেই রকম ছোট গল্পে বর্ণিত দেশ কাল ও পাত্র হরেক জাতির মতন পাঠকের মানস মুকুরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। গীতিকবিতায় আছে হৃদয়াবেগ—ছোট গল্পে আছে মননশীলতা। গীতিকবিতায় আছে সুরের ঝঙ্কার—এ সুর নদীর উচ্ছল কলতানের মাঝে ধরা পড়ে। ছোট গল্পে আছে প্রবহমানতা—যে প্রবহমানতা ঘটনার স্রোতের মাঝে নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত।

ছোট গল্পের এই প্রবাহমানতাকে নাটকের গতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সার্থক ছোট গল্পগুলো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়—যেহেতু নাটকীয় উপাদান থাকে প্রচুর। একাঙ্কিকা নাটক হ'য়ে যদি তাতে নাটকীয় speed না থাকে তাহলে সেই একাঙ্কিকা অসার্থক। আবার পঞ্চমাঙ্কের Triology নাটক speedর দুর্ব্বার গতির সাহায্যে পাঠক মনকে সমাপ্তির সীমারেখায় নিয়ে যেতে সমর্থ্য হয়। আজকাল দৃশ্য নাটকে খুব কম থাকে—তবুও সে দৃশ্য জমে না অথচ পূর্ব্বসূরীরা দৃশ্যের পর দৃশ্য দর্শকদের সামনে হাজির করেছেন—তবুও মনে ক্লান্তি আসেনি। ছোটগল্পের প্রবহমানতা আরও বেশী দুর্ব্বার হয় এর কারণ—অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বোধের অবতারণা নেই এতে। যতটুকু বলবার প্রয়োজন ততটুকু বলতে হবে। অনাবশ্যক কোন কিছু বলা চলবে না। ছোট গল্পে অলংকরণ থাকে না। দেহ সুষমা না থাকলে অলংকারের সৌন্দর্য্য কুশ্রী নারীর দেহে যেমন সেই রকম হচ্ছে ছোট গল্প। ছোট গল্প নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ একখানি হীরকখণ্ড। সুতরাং অলংকরণ হীন। নিজের মুড, ইমেজ এবং মননশীলতার মাঝেই ছোট গল্পের সৌন্দর্য। যে নারীর দেহ সুষমা আছে তার অলংকরণের কী প্রয়োজন? অসার্থক লেখকের হাতে পড়েই ছোট

গল্পের অলংকরণ হয়ে থাকে। ছোট গল্প তখন নিজের ভারে আর নড়তে পারে না। অলংকরণের শক্তি ছোট গল্পের ক্ষুদ্র প্রাণকে বধ করে। কথাসাহিত্যের এই শাখায় এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকবে না যা রসকে ব্যাহত করতে পারে। এমন একটী কর্মা থাকবে না যা মনের ভাবকে আচমকা থামিয়ে দিতে পারে, এমন একটী পূর্ণযতি থাকবে না যা মনের কপাটে হঠাৎ ঘা দিতে পারে।

অগ্রগণ্য একজন লেখক ছোট গল্পকে এক পূর্ণযতির সাথে তুলনা করেছেন। সোচ্চারিত প্রাণ হবে ছোট গল্পের। সোচ্চার কাহিনী আত্মনিষ্ঠভাবে এক জায়গায় এসে স্বমহিমায় থেমে যায়। যতি, অর্দ্ধযতি এবং বিরাম সেই সোচ্চার কাহিনীর মাঝে আপনা থেকে আসবে, উৎসারিত হবে। শিল্পী শুধু পাঠকদের আসরে কাহিনী তুলে ধরবেন; সমাপ্তি টানবেন শেষ সীমারেখার একপ্রান্ত বিন্দুতে, যে প্রান্তবিন্দু তিনি দেখতে পারছেন। এই প্রান্তবিন্দুতে এসে একটী পূর্ণযতি দিয়ে গল্পকার তার কাহিনী শেষ করবেন। লেখক জানেন তার কাহিনী তার বেশী অগ্রসর হবে না।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত পর্ব। এই সিদ্ধান্ত পর্ব নাটকের প্রাণ। এই হচ্ছে নাটকের কাহিনীর চূড়ান্ত শীর্ষ। নাটকের action যেমন এই চূড়ান্ত শীর্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসে ছোট গল্পের সীমারেখা সাধারণতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পূর্ণযতির কাছে চূড়ান্ত ভাব প্রকাশের পর শেষ হয়।

আরও একটী কথা আছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্ককে আলঙ্কারিকদের ভাষায় গর্ভসন্ধি বলা হয়। গর্ভসন্ধির পর আরও দুটী অঙ্ক আছে। ছোটগল্পের কিন্তু স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। গল্পকার এই চূড়ান্ত শীর্ষে এসে তার কাহিনী আকস্মিকভাবে শেষ করতে পারেন, সীমারেখা পূর্ণযতির মারফৎ শেষ হয়। অর্থাৎ নাটকের climax বা চূড়ান্ত শীর্ষে এসে গল্প শেষ করে গল্পকার চমক সৃষ্টি করতে পারেন। নাট্যকারকে আরও এগোতে হয়; চূড়ান্ত শীর্ষের actionকে কেন্দ্র ক'রে চরিত্রচিত্রণ করতে হয়। গল্পকার সে ভারটী থেকে নিজে মুক্ত হয়ে পাঠকদের উপর তা ছেড়ে দেন। একটা চমক আর অতৃপ্তি থাকে পাঠকের মনে। পাঠক তখন পাত্রপাত্রীকে নিজেই বিচার করেন। যে পূর্ণযতি তৃতীয় অঙ্কে গল্পকার টানেন তা কিন্তু নাট্যকার পারেন না। climaxর পর anti climaxর রূপায়ন নাট্যকারকে করতে হয়। যে সব গল্পকার জীবনটা নাটকের মতন মনে করেন তারা এই রকমভাবে গল্প শেষ করেন। দ্রুতসঞ্চারী গতির প্রবহমানতার ভিতর পাঠকের মন শুধু তখন কাহিনীর মাঝে বাঁধা পড়ে আকুলি বিকুলি করে। অজানা বিস্ময় ও রহস্য মনকে আপ্লুত করে। কাহিনীর সংঘাত এবং নাটকীয় ঘটনা মনকে শেষ যতির কাছে নিয়ে যায়। তবু প্রশ্ন থাকে—Suspense মন থেকে কাটে অথচ সেই suspenseর ইঙ্গিত গল্পকার কাহিনীতে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তাই ছোট গল্প শেষ হয়েও শেষ হয় না।

আর এক শ্রেণীর মননশীল লেখক আছেন, যারা গর্ভসন্ধির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে পূর্ব্বে বলে যান তারপর সেই Suspense বা রহস্যবোধ কাহিনীর পাত্রপাত্রীর মারফত নিপুণ নিষ্ঠার সহিত

বিশ্লেষণ করেন। জীবনের সহজ সরল রূপকে একটি মননশীলন রূপ দিয়ে, হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে সহজ বিশ্বাস ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে প্রকাশ করেন। নাটকের গর্ভসন্ধিকে তারা বিশ্লেষণ করেন। নাটকের গর্ভসন্ধি কাহিনীর পটভূমিকা। বিমর্ষসন্ধি ও উপসংহারের সুখ দুঃখ ও বিস্ময় বোধকে তারা একটা মানবিক দার্ঢ্য স্তোতনা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এদের লেখায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ উৎসারিত হয়। এরা বাইরে ঘটনার চমক সৃষ্টি না করে অন্তরে অনুভূতির চমক সৃষ্টি করেন। সাধারণ জীবনের ঘন ঘটার মাঝে জীবনের শান্ত প্রশান্ত মহিমা এরা আঁকেন। পাঠকদের মনে প্রশ্ন না তুলে সমাধানের চেষ্টা করেন, ইংগিত দেন। এরা শান্তরসের সাধক।

প্রথমোক্ত গল্পকারদের গল্পগুলিকে নদীর উদ্দামতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রাথমিক গতিতে নদী ভৈরবী অবস্থায় প্রবহমান। জলের গর্জন আছে। তটকে ভঙ্গ করে। সেই জলের গর্জনে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও অসন্তোষ অথচ এগুলির মাঝে চমক আছে। জীবনের বাস্তব প্রশ্ন গুলো রহস্যময় হয়েও মুখর।

শেষোক্ত গল্পকারদের নদীর অন্ত গতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এদের মাঝে প্রশ্নের চেয়ে মীমাংসার ইংগিত বেশী থাকে শান্ত নির্জন শিল্পীর ভাব। জীবনবোধের বিরাট প্রশ্নগুলিকে তারা সহজ বিশ্বাসে বিশ্লেষণ ক'রে এক সহজ সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করেন। বিরাট জীবন-বোধ ও খণ্ড সত্যবোধ সাগরে অন্তর্লীন হ'য়ে পরস্পর মোহনায় মিশে যায়। নদীর এক খণ্ড ধারা শেষ স্তরে যেমন বহুধা হয়ে মিশে যায় সাগরের সাথে তেমন জীবনের অখণ্ড বোধকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে মূল সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। এরা রসকে শাসন করে নতুন রস সৃষ্টি করেন। সাহিত্যস্রষ্টার পর্য্যায়ে এরা পড়েন।

ছোটগল্পের উপজীব্য হচ্ছে Plot বা আখ্যানবস্তু। এই Plot হচ্ছে রসসৃষ্টির প্রধান আঙ্গিক। অনেকে Plotর উপর জোর দেন-effect of totalityকে পূর্ণতর ভাবে বিকাশ করবার জন্য; এ সব কাহিনী সাধারণতঃ ঘটনা প্রধান হ'য়ে থাকে। Plotর উপর যারা জোর দেন তারা গল্পের সমাপ্তি এক চমক লাগিয়ে শেষ করেন, এই সব Plot বা আখ্যানবস্তু খুব ঘনপিনদ্ধ। সেই জন্য কাহিনীর প্রবহমানতা পাঠকের মনে বেশ কৌতূহল জাগায়। ঘটনাবহুল ছোট গল্প যারা লেখেন তারা আগে থেকেই জানেন কোন প্রান্তিক অথবা চরম বিন্দুতে তারা গল্প শেষ করবেন। মনোবিকলনের চেয়ে এরা সাধারণতঃ ঘটনার উপর জোর দেন। ঘটনার বক্তব্যকে এরা বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

বার্ণাড্ শ নাটককে explanation বলেছেন; গলস্ওয়ার্থী ছোট গল্পকে Suggestion বলেছেন। এরা সাধরণতঃ সমস্যামূলক কাহিনী লেখেন। গল্পের চেয়ে বক্তব্যই প্রধান। জীবনের সমস্যাসঙ্কুল সমস্যার সামান্য ইংগিত দেন; সমাধান করবার ভার পাঠককে দেন। গল্পকার সমস্যাগুলো শুধু তুলে ধরেন। সামাজিক ধ্যানধারণা, মানবিক চেতনা, অন্ধ কুসংস্কারগুলো সাধারণতঃ গল্পের পটভূমিকা। এই সমস্ত লেখকরা বাস্তবকাহিনী লেখেন—এবং বাস্তব সমস্যা-মূলক কাহিনী লিখতে গেলে যে নানাবিধ জ্ঞান থাকা দরকার তা তারা বোঝেন। এরা কেউ

কেউ আইন জানেন, অর্থনীতি জানেন, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক সমস্যাগুলো বেশ নিপুণভাবে তুলে ধরেন।

আবার আর এক দল লেখক আছেন যাঁরা চরিত্রচিত্রণ পছন্দ করেন। কাহিনীর আঙ্গিক সামান্য—সমস্যাও আছে। মানব জীবনের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র সামান্য কলাকৌশলের সাহায্যে পরিস্ফুট করেন Cause এবং effect দিয়ে। মানব মনের দুর্জ্ঞেয় দুর্গদ্বারের চাবি এঁরা সূক্ষ্ম কার্য্যকলাপ অথবা ধ্যানধারণা দিয়ে পরিস্ফুট করেন। ঘটনার পূর্ব্বাপর সম্পর্কে ধরে, পাত্রপাত্রীকে কাহিনীর মাঝে সংযোজিত ক'রে সুনিপুণভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেন। চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে অনেক সময় ছোটগল্প শ্লথ হয়ে পড়ে। তবে যাঁরা চরিত্র সৃষ্টি করেন তাঁরা সাধারণতঃ ঘটনাপ্রবাহকে মোচড় দিয়ে অন্তপর্বে এক দুর্বার গতি দিয়ে গল্প শেষ করেন। তবে ছোট গল্পে চরিত্র সৃষ্টি করা এক বিশেষ দুরূহ কাজ, এর অবসরও কম, পাঠকদের মনে ধৈর্য্যচ্যুতি আসতে পারে কারণ মুড বা ইমেজ নষ্ট হয়ে যাতে পারে—ক্ষুদ্র গল্পে—যদি না গল্পের মাঝে মনকে সহজে বাঁধতে পারা যায়। পৃথিবীতে আরও কয়েক শ্রেণীর গল্পকার আছেন। সাঙ্কেতিক গল্পকার হিসাবে ও গল্পের যাদুকর হিসাবে যাঁদের নাম করতে হয়। সাঙ্কেতিক সাহিত্যসেবী আঁদ্রিভের নাম করতে হয়। এঁর গল্প অনন্ত সাধারণ। তাঁর দেশ, কাল ও পাত্র সবকিছু এক বিশিষ্ট পর্য্যায়ের; এক রূপকল্প জগতের কাহিনী ইনি বলেন। কাহিনীর উপজীব্য সংকলনও অদ্ভুত। অনন্ত জীবন, অনন্ত যৌবন এবং মহাশূন্যতা এঁর গল্পের বিষয়বস্তু। লেখক পূর্বজন্মে বিশ্বাসী। খণ্ড প্রবাহমান কাল বর্ত্তমানে প্রবাহিত তাঁর গল্পে। আবার মহাকালের অসীমতার কাছে জীবনের সব চিন্তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তিনি বিশ্বপ্রেমিক। খণ্ডের মাঝে সত্যের এক বর্ণাঢ্যরূপকে তিনি রূপায়িত করেছেন। তাঁর গল্প ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। গল্পের বাঁধুনি তাঁর দৃঢ়। একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীবনের অতল স্পর্শে তিনি চলে যান। মানবপ্রেম তাঁর কাহিনীর প্রধান কথা। ইনি বিশ্বাসী শিল্পী। পৃথিবীর সব কিছুতেই সত্য আছে এ তিনি মানেন। তাঁর গল্পের গড়ন অত্যন্ত সুদৃঢ়। কাহিনীর হয়ত ঘনঘটা খুব নাই তবে মননশীলতা আছে।

পৃথিবীর এক লেখক ছোটবেলায় সেক্সপীয়ারের মত নাট্যকার হবার বাসনা মনে মনে পোষণ করতেন। নাট্যকার তিনি হতে পারেন নি বটে কিন্তু গল্পকার হয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন। আলো আর আঁধারের ছটা তাঁর কাহিনীতে। তাঁর গল্প পড়তে পড়তে সেই রূপজগত মানুষের মানস মুকুরে তন্ময়তা ও কল্পনার ইন্দ্রধনুর ছটা এনে দেয়। এক অতীন্দ্রিয় যাদুকরী পটভূমিকা তাঁর গল্পে। সে গল্পের প্রাণময়তা এত যে মন পাখ্না মেলে উড়ে যায় সেই জগতে। ইনি হচ্ছেন হ্যানস ক্রিশ্চান এ্যাণ্ডারসন্। মানুষ গল্প ভালবাসে। শিশুরা জন্মেই সোনার বরণ রাজকন্যা আর কুঁচ্ বরণ কেশের বর্ণময় ছটা মানসমুকুরে দেখে। দাদু বা দিদিমা হয়ত সেই শিশুকে গল্প শোনান। শিশু তন্ময় হ'য়ে শোনে। দাদু বা দিদিমারা বলে যান। তাঁদের লক্ষ্যই থাকে না সেই শিশু আমির সাথে বৃদ্ধকালীন আমির পূর্বতন শিশু আমি এক সাথেই আত্মলীন হয়ে খেলা করছে। এ কৃতিত্ব কম না লেখকের।

ছোটগল্প শেষ হয়েও তাই শেষ হয় না। এর কারণ আর কিছু নয়। সার্থক শিল্পীরা রসকে শাসন ক'রে নতুন রস সৃষ্টি করেন অথবা সেই কাহিনীর মাঝে চিরন্তন আবেদন মানুষের কাছে থেকে যায়; যে আবেদন হৃদয়ে শুধু উৎসারিত হতে থাকে।

ছোটগল্প যাঁরা লেখেন তাদের একটা বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে। গল্পের Representationটার উপর সব কিছু নির্ভর করছে। পাঠকের মনে গল্প উৎরিয়ে যায় যদি রচনাশৈলী নিপুণ পাকা হাতের হয়। গল্পের effect of totality বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধারণতঃ Representation বা রচনাশৈলীর উপর নির্ভর করে। এই দুটী যিনি পাদ-প্রদীপের সামনে তুলে ধরবেন তিনিই সার্থক গল্পকার। মনে রাখা উচিত গল্পের প্রাণ হচ্ছে গল্প—তারপর আসছে চরিত্রচিত্রণ, মনোবিকলন বা অন্যান্য কোন আঙ্গিকের আবেদন।

সতীন

আরতি ঠাকুর

ভোর বেলাই আবার কমরুদ্দীন এসে হাজির। সকাল থেকে উঠে রাত অবধি এই কিউরিওয়ালাগুলোর জ্বালায় চিত্রিতা অস্থির হোয়ে ওঠে। এদের দেখলেই চিত্রিতার গায়ে যেন জ্বালা ধরে কিরকম। যত রাজ্যের ভাঙা চোরা যা হোক কিছু এনে গছিয়ে দিয়ে যাবে। তাই কমলেশ হাসিমুখে নিয়ে নেবে। দরাদরির কোন প্রশ্নই ওঠেনা। ছেঁড়া একটা ধুরধুরে বালুচর শাড়ী একশো বছরের পুরনো বলে চালিয়ে দিল আর কমলেশ তো তার ডিজাইন দেখে দেখে মহা খুশী। তারপর মাসের প্রথমে যখন মাইনে পাবে তখন এই কিউরিও পাওনাদারদের দেনা শোধ করতেই রোজগারের একটা মোটা অঙ্ক চলে যাবে।

এমনি ভাবেই আজ কত বছর কেটেছে তবুও কমলেশের কিউরিও কেনায় শেষ নেই। এ ঠিক মদের নেশার মত। পুরনো শিল্প বস্তু দেখলেই ও পাগল হোয়ে ওঠে কেনার ঝোঁকে। তার উপর তাতে যদি একটু কোন বিশেষত্ব থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কাছে টাকা না থাকলেও যেখান থেকে যা কোরে হোক টাকা ও যোগাড় কোরে কিনবেই—এরকমই ওর খেয়াল: মাঝে মাঝে চিত্রিতা ভীষণ চটে যায়, বলে—এরকমভাবে কতদিন আর কষ্ট কোরে সংসার চালাবে? টাকা নেই পয়সা নেই, ধার কোরে তবুও জিনিষ কিনতে হবে?

কমলেশ হাসিমুখে উত্তর দেয়—রাগ কোরনা চিত্রা, কিউরিও দেখলেই আমায় কি যে নেশায় পেয়ে বসে, কি বোলবো। আমার জীবনের সঙ্কল্পটা যে কবে পূর্ণ হবে তা ভগবানই জানেন। এ সংগ্রহগুলো দেশকে দিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

কমলেশের কথায় চিত্রিতা ফোঁস কোরে ওঠে—কি বোলছ তুমি, সংসারে পয়সা না দিয়ে, আমায় কিছু না দিয়ে, ছেলেমেয়েদের ভাল পরা ভাল খাওয়া থেকে বঞ্চিত কোরে এত কষ্ট কোরে এগুলো কিনে শেষকালে দান কোরে দেবে? সারা মাসটা কি কোরে সাংসার চালাতে হয় তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

ভীষণ ক্ষিপ্ত হোয়ে ওঠে চিত্রিতা। কমলেশের কথা শুনে অবধি নিজের উপরই ওর রাগ হচ্ছে। মনটা একটা চাপা আক্রোশে গুমরে গুমরে উঠেছে। কেন ও শক্ত হোতে পারেনা? কেন চিত্রিতা কমলেশকে জোর কোরে বারণ কোরতে পারেনা—না তুমি কিছুতেই কিনতে পারবে না এগুলো, আর আমি কষ্ট কোরতে পারবনা কিছুতেই। শিল্পীর স্ত্রী হওয়া কি এত জ্বালা! জ্বালা এবং আকর্ষণ এই দুটোর মাঝে কিরকম যেন দিশেহারা হোয়ে পড়ে চিত্রিতা।

কমলেশ সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—আমার সুখে কি তুমি সুখী হওনা চিত্রা? এগুলো শুধু আমার নিজের খেয়ালের জন্য কচ্ছিনে—এসকল সংগ্রহ দেশের জন্য দশের জন্য। আমার নিজের জন্য কিছুই করছিনে চিত্রা, তা তুমি তো সবই জান।

কমলেশের কথায় চিত্রার রাগ জল হোয়ে যায়। সত্যিতো কেন ও মিছিমিছি ওর ওপর

রাগ করে? আহা, বেচারা কমলেশেরও কি কষ্ট হয় না? ও-ওতো ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাইরে। ওর বিয়ের আগে থেকেই না খেয়ে না দেয়ে কত কষ্ট কোরে পয়সা বাঁচিয়ে কিনে কিনে জমা কোরেছিল কিউরিওগুলো। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এতটুকু নজর নেই। শুধু শুধু ওর উপর আর রাগ কোরবেনা চিত্রিতা। কমলেশের ভালোবাসায় ওর হৃদয় পরিপূর্ণ। চিত্রিতা পরিতৃপ্ত। আর কখনও ঝগড়া কোরবেনা কমলেশের সঙ্গে—মনে মনে এই ঠিক কোরলে চিত্রিতা।

কমলেশ কাজ করে এক বিলিতি প্রচার-প্রতিষ্ঠানে। সেখানকার শিল্পীদের ডিরেক্টর ও। এই তরুণ বয়সেই ও বেশ নাম কোরেছে শিল্পী হিসেবে। শিল্পী হিসেবে ওর প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। যা মাইনে পায় তা দিয়ে ওর নির্ব্বিঘ্নে সুন্দরভাবে সংসার চলে যেত। কিন্তু কিউরিওর পেছনে অনেক টাকা চলে যায়। কোন রকমে সংসারটা টেনে চালায় চিত্রিতা।

উৎকট নেশা ওর কিউরিওতে। এর জন্য ও নিজে ভেসে যাক, সংসার স্ত্রীপুত্র ভেসে গেলেও ওর হুঁস নেই।

একবার ছেলের ভীষণ অসুখ হয়। সেবারে মাসের প্রথমেই সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেছে ও। ছেলের চিকিৎসার পয়সা অবধি ধরে নেই। চিত্রিতা ভয়ে বিহ্বল অস্থির হোয়ে পড়েছিল। ভাবনার ঠেলায় ওর চোখে মুখে একটা রুঢ়তা ফুটে উঠেছিল। তিনদিন ধরে ছেলেটা জ্বরে পড়ে আছে, তবুও ডাক্তার ডাকবার সামর্থ্য নেই। অবশেষে চিত্রিতা মরিয়া হোয়ে বলেছিল—আর কত দেরী কোরবে? এবারে তোমার কিউরিও বাঁধা দিয়ে নিয়ে এসো কিছু টাকা, গয়না গাটি যা ছিল তোমার আলায় তো সব গেছে।

যে কথা সুপ্ত ছিল ওর মনের অন্ধকারে, তাই চিত্রিতা টেনে বার কোরে আনলে আলোর সামনে। একদিকে প্রাণপ্রতিম ছেলের অসুখ অন্যদিকে জীবনসর্ব্বস্ব কিউরিও, এই দোটানার মধ্যে ওর বিবেকে অনবরত কে যেন চাবুক মারছিল। কমলেশ ওর অন্তরের সংঘাত আর বিবেকের দ্বন্দ্ব নিয়ে কি রকম যেন ভুগছিল। চিত্রিতার কথায় ওর হৃদয়ের ফল্গুধারা উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো চাপা বেদনায়। স্তিমিত কণ্ঠে বললে—তাইতো আর দেরী করা যায়না চিত্রিতা, আমিও তাই ভাবছি।

কমলেশের ভাবান্তর লক্ষ্য কোরে চিত্রিতা বলে—এক কাজ করা যাক, আমার এই হাতের বালা জোড়া বাঁধা দিয়ে বরং কিছু নিয়ে এসো।

—না, না তা কি কোরে হয় চিত্রা, তুমি একেবারে রিক্তহাতে থাকবে?

—তাতে কি হোয়েছে, দুদিন পরেই আবার ছাড়িয়ে আনলে চলবে। চিত্রিতা আশ্বস্ত হোয়ে হোয়ে বলে আর তাছাড়া বাজারে তোমার কিউরিওর চেয়ে এই সোনার মূল্য অনেক বেশী—টাকা অনেক বেশী পাওয়া যাবে।

কমলেশের সংসারের হালচাল এই রকমই। চিত্রিতা বাইরে রাগ দেখালেও অন্তরে যে এ ব্যাপারে কিছু ক্ষোভ পুষে রাখে এমন নয়। মাঝে মাঝে ওই বরং ভাল কিছু জিনিস দেখলে

কমলেশকে উৎসাহিত করে কেনার জন্য। চিত্রিতারও অনেকটা এ ধরণের প্রকৃতি বলে কমলেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। তা নইলে ওদের দুজনকার বনিবনাও অসম্ভব হোয়ে উঠতো।

খোলা জানলা দিয়ে শরতের শিউলি ভরা সকালের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। পাশের বাড়ীর বাগানে শিউলি ফুলের গাছ আছে। সেই গাছেরই একটা ডাল চিত্রিতাদের বাড়ীর জানলার ধার ঘেঁষে ছোঁব ছোঁব হোয়েছে। বেশ ভালো লাগছে ওর এখানটায় বসে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলে গেছে। নিরিবিলি নিভৃতে বসে ভাববার একটু অবকাশ পাচ্ছে।

আজ কদিন কমলেশ বাড়ীতে নেই, কালকাতার বাইরে গেছে কোন একটা কাজ উপলক্ষ্যে। গত রাত্রিতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ওর মনটা একটা রুদ্ধ আতঙ্কে অবসন্ন হোয়ে আছে। কমলেশের জন্য মনটা খারাপ লাগছে ভীষণ।

ভাবতে সুরু করে কলেজ জীবনের কথা। বেশ ছিল তখন। বেশ ছিল তখন। যেমন ও, তেমনি কমলেশ।

আগেকার দিনগুলো বেশ ভাল লাগে চিত্রিতার। কত কাক-ডাকা নিঝুম দুপুরে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে ও কমলেশের সঙ্গে। সারাটা দিন ঘুরেছে এধারে ওধারে—কোন কোন দিন মিউজিয়মে, আবার কোন কোন দিন সিনেমায়, গঙ্গার ধারে, নয়তো গড়ের মাঠে। আর মিউজিয়মে গেলে আসতে চাইত না কিছুতেই। কি যে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মূর্ত্তিগুলো দেখতো। ওর চোখের কোন ক্লান্তিও নেই। হয়তো একটা বুদ্ধের মূর্ত্তির দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে মিনিট দশেক; তারপর চিত্রিতাকে নির্দ্দেশ কোরে বলে—শোন চিত্রিতা, এই যে বুদ্ধমূর্ত্তিটা দেখছনা, এর হাতের পেশীগুলো লক্ষ্য করেছ, এতে গ্রীক আর্টের প্রভাব আছে। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে পেশীর এত শক্ত বাঁধন হয় না। চিত্রিতা হাঁ কোরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে থাকে।

ওরা বিয়ের পরই মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়েছিল পুরীতে। পুরী তীর্থস্থান এবং শিল্পস্থান দুইই। কমলেশের শিল্পীমন এখানে এসে চিত্রিতাকে পেয়ে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। রোমান্সের পূর্ণ আস্বাদন ওরা উপভোগ করেছিল পলে পলে। হেমন্তের শিশিরঝরা সকালে সমুদ্রসৈকতে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে ওরা সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়েছিল। সে কথা ভাবতেও ভালে লাগে চিত্রিতার। তারপর একদিন পূর্ণিমার রাত্রে বালিচরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকদূর এসে পৌছল। সেখানে কেবল ধূ ধূ করছে বালিপ্রান্তর। এত উন্মুক্ত জায়গা যে চোখের দৃষ্টি গিয়ে পৌছয় যেখানে দিগন্ত আর বালি-প্রান্তর মিশে একাকার হোয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বালির ঢিপি উঁচু হোয়ে আছে একটা ছোট টিলার মত। শুকনো আগাছায় তা ভর্ত্তি। সেই নিরবছিন্ন নিবিবিলিতে ওরা যে কতক্ষণ কথা বলে কাটিয়েছিল, কতক্ষণ দুজনে হাতের উপর হাত রেখে তন্ময় হয়ে ছিল— সে সময়ের কি হিসেব আছে? নিস্তব্ধ দুপুরে গভীর ঝোপঝাড়ের মাঝে মাঝে ওদের সাইকেল রিক্সা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঝাউবনের আড়ালে। দুপাশে সারি সারি ঝাউগাছ আর মাঝে মাঝে পাথরে

আকীর্ণ ভূমি। সেই জনচিহ্নহীন ছায়াছন্ন তৃণভূমির উপর বসে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিল। কমলেশের শিল্পীমন শুধু চিত্রিতার নিখুঁত সৌন্দর্য্যের দিয়ে তাকিয়েছিল আবিষ্ট হয়ে।

ভাবতে বেশ ভালো লাগছে চিত্রিতার আগেকার দিনগুলোর কথা। পুরানো কথাগুলো স্মৃতির ভাণ্ডারে একটা খুশীর আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। এখনকার দিনগুলোও ভালোলাগে চিত্রিতার, তবে দিনগুলো এখন বড় বেশী গভীর, বড় বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর চোখের সামনে। তখন ছিল দিনগুলো হাল্‌কা তুলোর মত। রঙীন, অসংখ্য রঙে রাঙানো।

সেই রাঙানো মনের অতল গহ্বরে থেকে আবার ফিরে এলো চিত্রিতা বাস্তবের সত্যতায়। চাকর এসে একটা চিঠি দিতেই ভাবনার কাক উড়ে পালাল। চিঠির আখর দেখেই ও বুঝতে পেরেছে এ কমলেশের চিঠি। বুকের মধ্যে আর একবার বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল—মন ভরে উঠলো খুশীতে।

চিত্রিতা বসে ছিল আলুথালু হয়ে। উঠে দাঁড়ালো গায়ের আঁচল সংবৃত করে। আবার খুশী মনে কাজে লাগল ও। মনের আনন্দে অজানিতে গুন্‌গুন্‌স্বরে গানের কলিও দুএকটা গাইতে লেগেছে। সামনের সোমবার চিত্রিতার জন্মদিন। ভালোই হবে, কমলেশ তার আগেই এসে পড়ছে। এই জন্মদিনটায় চিত্রিতা কিন্তু কোন কাজই ওকে করতে দেবেনা। সারাদিন কমলেশকে নিয়ে ঘুরবে, সিনেমা যাবে, হোটেলে খাবে, তারপর আরও কত কি? আবার ফিরে যাবে ওরা আগেকার দিনগুলোতে—মুখর হয়ে ওঠবে ওরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে। ও কমলেশকে বলবে অন্ততঃ এই দিনটার জন্য মানে এই জন্মদিনের জন্যও কিছু টাকা পয়সা বাঁচিয়ে রাখতে—এবারে যেন আর খরচ না করে। আর একটা জিনিস চাইবে চিত্রিতা—একটা উপহার শুধু। বহুদিনের আকাঙ্খিত একটা মাদ্রাজী শাড়ী। মনের মধ্যে এসব জল্পনা কল্পনা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে ওর।

কমলেশ ফেরে কলকাতায়। গিয়েছিল খাজুরাহতে কয়েকটা পুরান মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য। এনেছে ও অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর অতীত ভারতের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—বহু পুরাতন বিষ্ণু মূর্ত্তি, দুর্গামূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি আরও কত কি? তারমধ্যে আবার কয়েকটা এনেছে অত্যন্ত ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। কি সযত্নেই না নিয়ে এসেছে।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কমলেশ চিত্রিতাকে বলে—দেখতো চিত্রা আমার প্যাকিংগুলো সব ঠিক আছে কিনা? ওগুলো খুলে একটা ঝাড়ন দিয়ে ভাল করে মোছার ব্যবস্থা কর তো আস্তে আস্তে।

চিত্রিতা রেগে যায় কমলেশের কথায়—কিরকম লোক বাবা! এতদিন পরে এসে ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর নেওয়া নেই, চিত্রিতা কেমন আছে তাও জিজ্ঞেস করল না—একেবারে কিউরিও নিয়ে সোহাগ দেখানো। রাগে অভিমানে চিত্রিতার দুচোখ ছাপিয়ে জল উপচে পড়লো।

মুখে কিছু না বললেও ভীষণ চটে যায় ও। তারপর তীব্র অভিমানে ফেটে পড়ে, বলে—তুমি কি রকম লোক? ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের খোঁজখবর নিলেনা, আদর করে দুটো জিনিস ও হাতে দিলে না ওদের! চিত্রিতার কথায় কমলেশ সম্বিৎ ফিরে পেল—ও তাইতো রুন্টু, ঝুন্টুরা

কোথায় সব? তোমার শরীর ভাল তো? মানে আমি এই দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য মূর্ত্তিগুলো পেয়ে এত মত্ত হোয়েছি, এর জন্য আমার সংগ্রহের মূল্য অনেক বেড়ে গেল। একটা মিউজিয়ম করে সব দিতে পারলেই শেষ। আর কোন নেশাও থাকবে না, ঝোঁকও থাকবে না। তুমি রেহাই পাবে, তাই না চিত্রা।

স্বামীর আদর্শের কথা চিত্রিতা বহুবার শুনেছে—আজকেও শুনল আবার ওর সকল সংগ্রহ দানের সঙ্কল্প। কিই বা বলবে ও। কমলেশকে নিরস্ত করতে যাওয়া বৃথা। এমন উৎকট নেশা যার তার আদর্শে অংশীদার না হয়ে আর উপায় কি! চিত্রিতা তাই আর কথা বাড়ালনা। কমলেশের কথার উত্তরে শুধু বলে—তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, তোমায় আমি আর কি বোলবো।

কেমন যেন নিরুৎসাহের সুর ফুটে উঠলো ওর গলায়।

কমলেশ তাড়াতাড়ি কথার রাশ টেনে বলে—নানা আমি কি এখনই দান করতে যাচ্ছি না কি? তোমায় না জিজ্ঞেস করে তোমার মতামত না নিয়ে আমি কিছুতেই এমন কাজ করবনা।

আজ চিত্রিতার জন্মদিন। সকাল থেকেই সারা ঘরে একটা খুশীর হাওয়া ছড়িয়ে আছে যেন। সংসার থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছিল চিত্রিতা। সেই লুকান টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের নতুন জামা কাপড় করিয়েছিল চিত্রিতা—সে জামা দুটো পরিয়ে দিল ওদের। তারপর কমলেশের সঙ্গে প্ল্যান করল বিকেলে সিনেমায় যাবে—রাত্রে বাইরে খাবে আজ। কমলেশ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নেবে বলেছে আজ।

বিকেল হতে না হতেই চিত্রিতা সাজসজ্জা করে বসে আছে কমলেশের প্রতীক্ষায়। কিরকম একটা খুশীর আমেজ ওকে ঘিরে আছে যেন। ওর অন্তরে আনন্দের ঢেউ যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বহুদিন পর আজ ও কমলেশের দীর্ঘ সঙ্গ পাবে। বহুক্ষণ ধরে কমলেশের সঙ্গে আনন্দের ভাগ বন্টন করতে পারবে। আজকাল ও বেশী বেরুতেই পারেনা। সংসারের নানা ঝামেলা, তারপরে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা। এতটুকু অবসর মেলেনা ওর সারাদিনে। আজ কত করে কাজের ফাঁকেই ওর এই অবসরটুকু করে নিতে হয়েছে। রুন্টু ঝুন্টুকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওর বাপের বাড়ী। আজকের এই অবসর ও তিলে তিলে উপভোগ করবে—উপভোগ করবে অপার আনন্দ আর অবারিত সময় নিয়ে।

বিকেল উত্তীর্ণ হ'ল, সন্ধ্যা হব হব হয়েছে, কৈ কমলেশ এখনও ফিরছেনা কেন? চিত্রিতা ভাবে। মনের মধ্যে নানা দুর্ভাবনার আলোড়ন আন্দোলিত হয়ে উঠলো। তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটলো? না না ওসব ভাবনা আজ মনের মধ্যেও আনবেনা চিত্রিতা। কমলেশ তো ভালো করেই জানে যে আজ ওর জন্মদিন তবে এত দেরী করছে কেন, সেই বিকেল চারটের সময় ছুটী নিয়ে আসার কথা।

রাত আটটা বেজে গেল, তবুও এলোনা কমলেশ। চিত্রিতা সাজগোজের ক্লান্তিতে অবসন্ন

হয়ে পড়ে—সারাদিনের উৎসাহ উদ্দীপনা ভেঙে পড়ল ক্লান্তিতে! দুঃখে অপমানে ওর কান্না এসে গেল—ঘরের একে কোণে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল অঝোরে। তারপর তন্দ্রায় জাগরণে দুর্ভাবনায় আরও কিছুক্ষণ কাটানোর পর অবসাদে এলিয়ে পড়ল ওর দেহ— ঘুম নেমে এলো ওর চোখে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, হঠাৎ কমলেশের কণ্ঠস্বরে চিত্রিতার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলল—এত দেরী করলে যে তুমি?

—হ্যাঁ চিত্রা, আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বড় দেরী হয়ে গেল। কমলেশ অপ্রভিভ হয়ে বলে।

—কোন বলতো? বিষণ্ণ হেসে চিত্রিতা বলে। অন্তরে ভিতর থেকে ওর কান্না চলে আসছিলো।

—অফিস থেকে ফিরছি চিত্রা, তাড়াতাড়ি তোমার জন্য একটা শাড়ী কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরবো বলে, এমন সময় কমরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা। ও আমায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল কাশিমপুরের রাজবাড়ীতে, সেখানে বহু কিউরিও নীলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে যত এড়াতে চাচ্ছি ও তত জোর জবরদস্তি করতে লাগলো আমার সঙ্গে। অবশেষে পাঁচ মিনিটের জন্য বলে টেনে নিয়ে গেল আমায়। হায়দ্রাবাদের নিজামের বহু টেম্পটাইল স্তূপীকৃত হয়ে আছে সেখানে। জিনিস দেখতে দেখতে ভীষণ দেরী হয়ে গেল। রাণী নিলুফারের কি সুন্দর একটা শাড়ী, দেখে আর লোভ সামলাতে পারলুম না। প্রায় তিনশ বছরের পুরোন। এই যে দেখ শাড়ীটা চিত্রা, কি সুন্দর দেখ—উত্তেজিত হয়ে ওঠে কমলেশ।

—দেখিও না, দেখিওনা আমায় শাড়ীটা, ওটা তো কিউরিও নয়, ও হচ্ছে আমার সতীন। রাগে দুঃখে অপমানে বুকভরা আর্ত্তনাদ করে চেঁচিয়ে ওঠে চিত্রিতা।

এক ছিল কন্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত দুপুরটাই ওর ভয় ভয় করে। কর্তাবাবুর কাছে যেতে হবে একটু বাদে। কর্তাবাবু এইমাত্র খেয়েদেয়ে বাইরে গেলেন। গড়গড়ার শব্দ শোনা যাবে এক্ষুণি। তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটু বা ঝিমোবেন। ঝিমোনো মানে যত রাজ্যের মামলা ফিকিরের জাল বিস্তৃত হবে। আজ বোধ হয় আর ঝিমোনো হল না। নিত্যপুরের জমিদার থেকেছে আজ ওদের বাড়ী, মৃগনয়নীর কানেও এসেছে কথাটা। ওঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে দাদার।

ওঁর সঙ্গেই হয়তো গল্প করবেন কর্তাবাবু।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে কর্তাবাবুর বাইরের ঘরের দিকে যায়।

না। গল্প তো করছেন না। ঝিমোচ্ছেন।

মৃগনয়নী গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। পাশে বসে।

ওপাশে একটা লম্বা খাটে বিশাল পাহাড়ের মত একটা মানুষ পড়ে আছে। নাকের ভেতরে তার শব্দ হচ্ছে। একটা অদ্ভুত শব্দ। কর্তাবাবুরও হয়। ভয়ে ভয়ে লোকটার দিকে তাকায় মৃগনয়নী।

কর্তাবাবুর ঠোঁট থেকে গড়গড়ার নলটা পড়ে যেতেই চমকে ওঠেন।

মৃগনয়নীকে দেখে বলেন,—তুই এসেছিস। শোন। উঠে বসেন কর্তাবাবু।

—বোস আসছি। বাড়ীর ভেতরে চলে যান।

মৃগনয়নী একা একা এত বড় একটা ঘরে বসে থাকে। নাকের শব্দটা শুনে ওর কেমন ভয় ভয় করে। কর্তাবাবু ফিরে আসেন। হাতে তাঁর একটি সোনার শেকল।

—আয়।

মৃগনয়নীকে নিয়ে লোকটির কাছে যায়।

ঘুমন্ত লোকটির হাত দুটো আস্তে আস্তে তুলে সোনার শেকল দিয়ে বাঁধল।

বেঁধে মৃগনয়নীর কানের কাছে বলেন,—ঘুম থেকে উঠতে গেলে, তুই বলবি উঠতে পাবেন না। জোর করে উঠতে গেলে চেঁচাবি। আমি কাছারী ঘরে রইলুম। কাজ আছে। চলে যান কর্তাবাবু।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে।

বিশাল লোকটি বড় বড় থাবার মত হাতের গোড়ায় মোষের গলার মত মোটা কব্জি দুটো সোনার শেকলে বাঁধা।

নাকের গর্ত দুটো কি বড় রে বাবা! উঃ কি ভীষণ শব্দ। মৃগনয়নী চোখ দুটো বুজে ফেলে শব্দটা একটু কমে আসে। আবার তাকায় ও।

ঘরের সামনে প্রায় বিশ বিঘে ফুল বাগান। দু ধারে হলুদ চাঁপার ঝোপ।

মাঝের গোল মাটির চাকার ভেতর বড় বড় গাঁদার পাহাড়। কত টগর, জুঁই আর গন্ধরাজ গাছ।

বাগানের পাঁচিলের এক পাশে এদের পাশে বেমানান দুটো কাঁঠাল গাছ।

পাতা বাহারের ছড়াছড়ি। বড় বড় এক একটি পাতায় রামধনু রঙ ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট কচুগাছের পাতা। হলুদ সবুজে তাতে রক্ত চন্দনের ছিটে পড়েছে মনে হয়।

পাতাবাহারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বিদেশী শাক সব্জীর চাষ। ছোলা ও শাক, বিট, গাজর বিলিতী বেগুনের চারা।

বাগানটি কর্ত্তাবাবুর নিজের হাতের তৈরী। রোজ ভোরে উঠে অন্ততঃ দু ঘণ্টা বাগানে বেড়ান।

বাগানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী।

ফুল আর পাতার বাহারে মনটা ওর প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এক অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে মনে। পা দুটো নাচতে থাকে। ছুটতে ইচ্ছে হচ্ছে। এক ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওই হলুদ চাঁপার কাছে। বাগানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে কি আরাম।

ভোঁস করে একটা শব্দ হয়। চমকে তাকায় মৃগনয়নী।

বিশাল লোকটি নড়েচড়ে উঠছে। বলে ওঠে ও,—উঠবেন না।

লোকটি হাসে। শোবার আগে পান খেয়েছিল। দাঁতে তখনও পানের ছোপ।

—কর্তাবাবু! চেঁচিয়ে ওঠে মৃগনয়নী—কর্তাবাবু!

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে কর্তাবাবু আসেন। বাবা আসেন। মেজ জ্যাঠা আসেন। আরও অনেক লোক। বিশাল লোকটি হকচকিয়ে চারদিকে তাকায়।

কর্তাবাবু এসেই যেন বিস্ময়ে বলেন,—একি আপনাকে বাঁধল কে? একি মশাই আমাদের এই এক ফোঁটা মেয়ে আপনাকে বেঁধে পাহারা দিচ্ছে।

সোনার শেকলটা ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসির ভেতর কর্তাবাবুর গলা শোনা যায়—আপনি তো বন্দী। মেয়ে দান করে মুক্ত হতে হবে।

এঁর মেয়ের সঙ্গেই মৃগনয়নীর দাদার বিয়ের কথা হচ্ছে। অপরূপ ঠাট্টার কথা ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে।

মৃগনয়নী বাড়ীর ভেতর যেতে না যেতে কর্তামা, মা, মেজজেঠি আর আশে পাশের সব মেয়েরা ঘিরে বসে মৃগনয়নীকে।

—বল্, কি ব্যাপার?

মৃগনয়নী আজ সকলের কাছে প্রিয়। জীবনে এই প্রথম ওকে সবাই একটা মানুষ বলে

মেনে নিল। সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। কর্তাবাবার প্রিয় হলে সকলের প্রিয় হবে এ আর আশ্চর্য কি?

—বল্ না। কি হোল?

মৃগনয়নী একটু হকচকিয়ে যায়। বড় বড় চোখ মেলে তাকায় সামনের দিকে। তারপর যা ঘটেছিল, সব বলে। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি। খুব জব্দ হয়েছে ভাবী বেয়াই।

এগুলো ছিল তখনকার দিনে জমিদারী ঠাট্টা। ঠাট্টা যেমন গুরুতর তেমনি উপভোগ্য।

মেয়েদের ভীড়ে ঘেমে ওঠে মৃগনয়নী। ভীড় একটু কমতেই ও চুটে চলল হৃদয়দার ঘরে।

হৃদয় বারিক ঘরেই ছিল। ছোট একখানি তক্তপোষ ওর ঘরে। ঘরটি ওর একার। এক কোণে ছোট একটু ঘর।

কাছে যেতেই হৃদয়দা ওকে কোলে টেনে নিলে। আঙ্গুলকাটা হাতের তেলো বুলোতে লাগল ওর পিঠে।

হৃদয়দার চোখ দুটো টকটকে রাঙা। গাটা যেন বড্ড গরম।

বোধহয় কিছু আগে বড় একছিলিম হয়েছে। সে গরমটা টাটকা।

মৃগনয়নী হৃদয়দার গা ঘেঁষে বসে। দুপুরের ওই গল্পটা ভুলতে পারেনি ও।

জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা, হৃদয়দা, পচাপুকুরের বনের পাশে পাঁচীলের ভেতর একটা মানুষ গেঁথে ফেলেছিলো?

হৃদয় রাঙা আধ বোজা চোখ দুটো একটু তুলে হাসে,—হুঁ। কত! একটা কিরে! ওতো এক হাত তফাৎ তফাৎ একটা করে মানুষ। একখানি ইঁট খসিয়ে দেখিস হাড় পাবি।

—বলো কি?

—হ্যাঁ, অমন তো হামেশাই হয়। এই তো সেবারে—

ব্যস্ আরম্ভ হোল হৃদয়দার গল্প। কত জমিদার কত রাজার গল্প। গল্পগুলো তিল থেকে তাল হয়ে যায় ছিলিমের গুণে। মৃগনয়নী হাঁ করে শোনে।

অনেক পরে তরঙ্গিনী ওকে ডাকতে আসে। সন্ধ্যে তখন উত্তরে গেছে।

মনে পড়ে বলত মৃগনয়নী। বিরাট জমিদার পরিবারে মানুষ হবার অনেক জ্বালা। বড় একটা ইঞ্জিন চল্‌ছে, সবাই ইঞ্জিনের তদারকে ব্যস্ত। পেছনের অগুন্তি কামরাগুলো ফালতো। ওগুলো ইঞ্জিনের জোরে আপনা আপনিই চলে আসবে। মৃগনয়নী এ পরিবারে অতি নগন্য ছোট একটি কামরা।

বছরগুলো তাই কাটলো একঘেঁয়ে। বেহিসেবী সংসারে খাওয়া পরার যেমন হিসেব নেই। মানুষেরও হিসেব নেই। মা বাবার নজরও পড়ে না বেশী সন্তানদের ওপর। কেউ নিজেরটির জন্যে নয়, সবাই সকলের জন্যে ব্যস্ত।

বড় হয়ে উঠলো ওরা। তরঙ্গিনী। বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পুটিদিও। দাদার হয়ে গেছে সেই জমিদার কন্যার সঙ্গেই। আর একজন সঙ্গিনী বেড়েছে ওদের। ওরা ডাকে, বড় বৌ। বৌ ডাকে, ঠাকুর কন্যা। ঠাকুর ঝি নয়। ঠাকুর কন্যা ডাকাই ওদের নিয়ম।

পুটিদির সঙ্গের মৃগনয়নীর ভাবটা জমে বেশী।

ফরসা পাতলা পুঁটিদি একটু ট্যারা। কিন্তু বড় নম্র, বড় মিষ্টি স্বভাবটি। পুঁটির সঙ্গেই ওর যত আলাপ।

বড় বৌয়ের বনে বেশী তরঙ্গিনীর সঙ্গে।

বিকেলে ভেতরবাড়ীর বাঁধা ঘাটে গা ধুতে যাবে ওরা দুজন একসঙ্গে। মৃগনয়নী আর পুঁটি যায় না। বড্ড জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। অকারণে খিল খিল করে হাসে। হঠাৎ এসে জাপ্‌টে ধরে।

দিদি বড় বিশ্রী সব ই'য়ে করে। ভাল লাগে না মৃগনয়নীর।

বড়বৌ এসব পছন্দ করবেই। নতুন বিয়ের পর কেনা এ সবে আনন্দ পায় শুনি?

গা ধুয়ে এসে পরিষ্কার করে গাটি মুছবে।

চুল বাঁধবে দুজন দুজনার। আলতা পরবে। ঠোটে আলতা মাখবে।

কাঁচ পোকার টিপ পরবে। ডুবে শাড়ীখানা বেশ এঁটেসেটে পরে বড়বৌকে নিয়ে তরঙ্গিনী যাবে আয়না মহলের ছাদে। থামের আড়ালে বসবে, তারপর গল্প জমবে দুজনের।

পুঁটি আর মৃগনয়নী আলাদা যাবে গা ধুতে।

পুঁটি ফরসা পাতলা মানুষ, হালকা জলপিপির মত সাঁতরে নিয়ে তুলে গিয়ে আসত শালুক ফুল। সাদা, কোনটা বা লালচে আভা।

অনেকগুলো শালুক ফুল সরু লম্বা গা সমেত নিয়ে আসত।

মৃগনয়নী ভাল সাঁতার জানত না। একটু ভারী শরীর শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখদুটো মেলে দেখত পুঁটির ছট্‌ফটে ভাবখানা। বড় ভাল লাগত ওর। পুঁটিকে ও সত্যিই ভালবাসে।

গা ধুয়ে দুজন ঘরে এসে শালুক ফুলগুলো পরিষ্কার জলে ধুয়ে রাখত একখানা রেকাবীতে। পুঁটির একটি ছোট শিব ছিল। কাপড় ছেড়ে দুজন ওই ফুল নিয়ে শিবের মাথায় দিত। কামনা কিছু থাকত ওদের মনে।

মৃগনয়নী বলত, তুই কি চাইলি শিবের কাছে পুঁটিদি?

—আমি? পুঁটি দুবার ঢোঁক গিলে বলত, তুই কি চাইলি?

—আমি? ইয়ে শোন কানে কানে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বলত, ভাল বর। পুঁটির কানের পাশে গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠত। বলত, দূর বোকা!

একটু থেমে তারপর স্বীকার করতে হোত, ও আমিত তাইই চাইলুম কিন্তু চাইতে কেমন ভাল লাগল না। বিয়ে না হলেই ভাল।

—কেন রে।

—অনেক জ্বালা! পুঁটির কথাটা একটু পাকা পাকা।

—কি আবার জ্বালা শুনি?

—দেখিসনি ও তরফের হরমোহিনী পিসী কি মার খায়। বরটা একটু পাগলা পাগলা।

—আমি তো দেখিনি! মৃগনয়নী কথা পালটায়, বলে, ও পুঁটিদি। ওই ছাতে চ। দিদি আর বৌদি কি কথা বলছে শুনিগে।

—দূর ওরা সব বাজে কথা বলে।

—কি বাজে কথা?

—ও তুই এখন বুঝবি না। সব অসব্য কথা।

(ক্রমশঃ)

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজে পৌঁছতে একটু দেরী হল সত্যজিতের। প্রায় বারোটা বাজে। তাই একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল। ঠাকুমার জন্যে দেরী হয়ে গেল ওর।—দে না বাবা ছুটো মন্ত্র পড়ে। শ্যাম আসতে পারবে না। ওর শরীরটা খারাপ।

—আমি ওসব পারব না। বিরক্ত হয়ে বললে সত্যজিৎ।

—লক্ষীটি, বাবা আমার চ। আমি কাচা কাপড় দিচ্ছি, কতক্ষণই বা যাবে। হাত ধরলেন বৃদ্ধা।

যত ঝামেলা তোমাদের কলেজ যাবার সময়। রেগে ওঠে সত্যজিৎ। কিন্তু রাগ করলেও ঠাকুমার কথাটা রাখে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে পুজো করতেও বসে। শান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওকে হাসতে দেখে আরো রেগে গেল সত্যজিৎ। গুম হয়ে চোখ বুজে বসে কোশাকুশি নাড়ল খানিক তারপর ছুটো ফুল ফেলে একটা টিপ করে প্রণাম ঠুকে উঠে পড়ল।

—ওমা, এ আবার পুজো হল নাকি! শান্তির এ মন্তব্য শুনেও সত্যজিৎ কোন উত্তর দিল না। সোজা বৈঠকখানায় চলে এল। সেখানে জামা কাপড়টা বদলে নিয়ে চটিটা পায়ে দিয়ে টেবিলের এদিক ওদিক কি খুঁজল, তারপর একটা চটি খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ভাত না খেয়েই।

সত্যজিৎ কলেজে পৌঁছে দেখে ক্লাস সুরু হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকতে সঙ্কোচ হল। কী করবে তাই ভাবতে থাকে করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু ও কি! আস্তে আস্তে যে সব ছেলেরা বেরিয়ে আসছে। কেন কি হল? সবাই হলের দিকে চলেছে। সত্যজিৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর ওদের পেছনে সেও এগিয়ে চলল।

সারা হল ভর্তি ছেলে। কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই। সত্যজিৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

অধ্যক্ষ এলেন ভারাক্রান্ত মুখে। ধীর কম্পিত স্বরে ঘোষণা করলেন—গ্রেট পোয়েট রবীন্দ্রনাথ ইজ নো মোর।

রবীন্দ্রনাথ নেই! আর জোড়াসাঁকোর সেই দোতালায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসবেন না, আর তিনি তাদের চোখের কৌতুহল মেটাবেন না সামনাসামনি বসে, আর তিনি কবিতা লিখবেন না, গান বাঁধবেন না। সত্যজিতের মন ব্যথায় বেদনায় ভরে ওঠে।

—এই যে চলুন—দিশারী সত্যজিতের হাতে চাপ দিয়ে বললে।

চমকাল ও। বললে—কোথায়?

—শোনেন নি? প্রিন্সিপাল বললেন যারা শেষ দর্শন করতে চাও, তারা বাইরে লাইন করে দাঁড়াও। যাবেন না?

—যাব বৈকি। আর ত দেখতে পাব না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সত্যজিতের বুক ঠেলে।

অসংখ্য মানুষ ভেঙে পড়েছে কবিকে শেষ বারের মত দেখতে। কবি বিদায় নিয়েছেন, পৃথিবীর নির্মম পদপ্রান্তে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবেন। বাইশে শ্রাবণ। আকাশের সব বিরহী মেঘ বাঙালীর মনে বেদনার বৃষ্টি হয়ে ঝরছে। আর তাঁকে চোখে দেখতে পাবেনা কেউ, সেই অনাবিল শুভ্রতা নিয়ে তিনি স্মিত হাস্যে মধুর করে দেবেন না দর্শকের মন।

কবি চলেছেন শেষ শয়ানে। সঙ্গে চলেছে মানুষের অবিরাম স্রোত। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই নিয়েছে ঐ শুভ্রতার সঙ্গ। পরশ পাথরের স্পর্শ পাবার কি আকুলতা। কিছু স্পর্শ পেলেও যেন মন একটু ঠাণ্ডা হয়। সবাই চায় ঐ অমূল্য স্পর্শ।

—চল একটু কাছে যাই। উত্তমা বললে সত্যজিতের পাশে এসে। পাশে দিশারী, খেয়াল নেই।

—দূর থেকেই শ্রদ্ধা জানা তমা, কাছে যাবার তোর উপায় নেই। দেখছিস না কি ভীড় কবির কাছে। বললে দিশারী কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য মাথার ওপর। রাস্তার দুপাশের বাড়ীতে ছাদ থেকে জলের ছড়া দেয় জনসমুদ্রের ওপর।

—শেষের দিনগুলোই কবির বড় দুঃখে কাটল। শান্তির সাধক পৃথিবীতে অশান্তির তোড় জোড় দেখে গেলেন। দিশারীর স্বর করুণ শোনাল।

—ওঁর শেষ কবিতাটা দেখেছ দিশা? উত্তমা বললে।

—হ্যাঁ।—চলতে চলতে বললে দিশারী। সত্যজিৎ নীরব।

আহিরীটলার চওড়া নতুন রাস্তাটা ছাড়িয়ে নিমতলায় জনস্রোত ঢুকল। আকাশের বুকে গোধূলির রঙ লাগছে। আর একটু বাদে অস্তমিত হলেন রবি সারা পৃথিবীকে অন্ধকারে ভরিয়ে।

কিন্তু আর যেন চলা যায় না। এতটুকু ফাঁক নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ভীড়ের চাপে। তবু চলার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে রাস্তা-ধোয়া চাপা কল খুলে ময়লা জল ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষের মাথায়। কোন আপত্তি নেই, কোন প্রতিবাদ নেই, বরং শান্ত মন আরো শান্তই করে।

—শ্মশানে ত আর ঢুকতে পারব না, এবার আমরা এখান থেকেই শেষ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেই। শ্মশানের কাছে আসতেই দিশারী বললে।

—হ্যাঁ, এবার একটু বসা দরকার। শ্রান্ত কণ্ঠে বললে উত্তমা।

—বেশ ত, আর যখন যাওয়ার কোন উপায় নেই তখন ফিরেই যাওয়া যাক।

—একটু কোথাও বসা যাবে না। উত্তমা জিজ্ঞেস করে।

—কাছেই আমাদের বাড়ী, সেখানেই—

—সেই ভাল। চল তমা, সত্যজিতের বাড়ীটাও দেখে আসা যাবে। দিশারী বললে।

তারপর ওরা ধীরে ধীরে জনসমুদ্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়।

ওদের বাড়ীর সামনে সদরে এনে যেন সত্যজিৎ একটু অপ্রস্তুত হল। এতক্ষণ যা ভাবেনি তাই ভাবতে থাকল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি মেয়েকে তার সঙ্গে দেখলে কি ভাববে, কি রকম ব্যবহার করবে ঠাকুমা, শান্তি? যদি উত্তমাকে অপমান করে? দ্বিধা আর ভয়ে হঠাৎ থমকে গেল সত্যজিৎ বাড়ীর ভেতর ঢুকে।

—কি হল, চলুন। উত্তমা বললে সত্যজিৎকে থমকে দাঁড়াতে দেখে।

—ও হাঁ, আসুন। একটু লজ্জিত হয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সত্যজিৎ। শেষে ওদের বাইরের ঘরে বসিয়ে বাড়ীর ভেতর এল সত্যজিৎ।

—ওমা, একি! এত কাদা মেখে এলি কোত্থেকে? উঠোনে সত্যজিৎকে দেখেই ভুবনমোহিনী বলে উঠলেন।

—রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন যে। তাই দেখতে গিয়েছিলুম।

—এই অবেলায় জল কাদা মেখে না দেখলেই কি চলত না। যাও, জামাকাপড় ছাড় গে। বাইরের ঘরে কারা?

—আমার সঙ্গে পড়ে।

—ওদেরও কাদা মাখাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলি! তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ওদের কলতলায় নিয়ে যা, কাপড় চোপড় এনে দে, ছাড়ুক। ওরে শান্তি, খান দুয়েক ধুতি নিয়ে আয় ত। হতভাগা খালি জ্বালিয়েই মারলে। ভুবনমোহিনী গেলেন আপন কাজে।

শান্তি এল গম্ভীর মুখে কাপড়-গামছা হাতে করে। কিন্তু সত্যজিতের চেহারা দেখে অনেক দিন বাদে খিল খিল করে হেসে উঠল।

—হাসছ যে?

—হাসার মত করলে হাসি আসে। এই নাও কাপড় গামছা।

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কেন?

—মানে একটি মেয়েও যে রয়েছে।

—তাই নাকি? আগে বলতে হয়। না, তোর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। কি মনে করছে! ছি ছি। দ্রুত পায়েই বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল শান্তি। পেছনে সত্যজিৎ।

—কিছু মনে করো না ভাই, সত্যজিতের কাণ্ডই এমনি। এই কাদাঝুলি মাখিয়ে তোমাদের দিব্যি বসিয়ে রেখেছে। এস ভাই, আগে কলতলায় চল দেখি। শান্তি গিয়ে উত্তমার হাত ধরল।

সত্যজিৎ যা ভয় করেছিল, সেটা কেটে গেল। বেশ সহজভাবেই শান্তি উত্তমাকে গ্রহণ করল। এতটা আশা করেনি সত্যজিৎ। শান্তিকে ভাল লাগল। মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

(ক্রমশঃ)

বারট্রাণ্ড রাসেলের সমাজদর্শন

জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত

এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সমাজচিন্তা আলোচনা করতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের অভিনবত্ব। বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের চিহ্ন বারট্রাণ্ড রাসেলের প্রতি চিন্তাক্ষেত্রেই বিদ্যমান। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মূল দান, যুক্তিবিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তিস্থাপন, ইতিহাসের নববিশ্লেষণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় সংযোজন এবং সমাজদর্শনে বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ—সর্বত্রই রাসেল নতুন এক পথের প্রদর্শক। শুধু পদপ্রদর্শনেই আবার ক্ষান্ত হননি রাসেল—রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজে হাতে-কলমে তাঁর আদর্শচিত্রের রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ অবশ্যই সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়—প্রচেষ্টার সততাই মানবসমাজে সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করবে। করেছেও।

এই কারণেই সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বোধ্য গাণিতিক দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও বারট্রাণ্ড রাসেলের পরিচিতি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ অবশ্য তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলী। সিডনী হুক এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন—

"In respect to clarity, wit and incisive force, he is indisputably one of the great masters of English prose".*

মূল্যবোধের ভিত্তিতে যাচাই করে যে কোনও সমাজদার্শনিকের বক্তব্যের মূল্য তত্ত্বটি উদ্ধার করা যেতে পারে। সেদিক থেকে রাসেল প্রসঙ্গে সহজেই বলা যেতে পারে যে মানবিক মুক্তিই তাঁর সমাজদর্শনের সর্বোচ্চ মূল্যাধার। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় এই মূল্যবোধ তাঁকে সব সময়ে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে রেখেছে। সাম্যবাদী সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের সমালোচক হিসাবে তাঁর লেখায় যে অসাধারণ তীব্রতা, তার ভিত্তিও উপরোক্ত মূল্যবোধে অটল আস্থা।

রাসেলের মূল দর্শনশাস্ত্রের হিমশীতল গাণিতিক রাজ্যের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সমাজদর্শনের যুক্তিসিদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপনে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। দর্শনশাস্ত্রের পূর্বসূরীদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর বিরাট পার্থক্য। বোধহয় এখানেও হিউম ও লাইবনিজ তাঁর অন্যতম পথপ্রদর্শক। রাসেল বিশ্বাস করেন না যে কোন দার্শনিকের দর্শনের সঙ্গে তাঁর সমাজদৃষ্টি বা সমাজদর্শনের কোনও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ থাকা উচিত। এই কারণেই তাঁর সমগ্র রচনার বিচারে একটা দ্বৈততার ছায়া অনেক সমালোচককে মুখর করে তুলেছে।

রাসেল বিজ্ঞানবাদী। অথচ বিজ্ঞানের দেশে বস্তুসত্যের রাজত্ব। সেখানে মূল্যসত্যের অনুসন্ধান অরণ্যে রোদন। স্পেন্সার বা মার্কসের গোঁজামিলে স্বভাবতই রাসেলের মন ভরেনি। যুক্তিবিজ্ঞানের এতবড় ফাঁকি রাসেল এ যুগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানবিদ হিসাবে দর্শনের বাজারে

* Philosophy of Bertrand Russell—Ed. by Schilpp.

বিক্রয় করতে হয় অসমর্থ, নয়তো অনিচ্ছুক! অথচ মূল্যবোধের ভিত্তি যদি মানবিক বিচার বোধের উপর নির্ভরশীল হয় এবং এই মূল্যবোধের উপস্থিতি যদি সমাজদর্শনের গোড়ার কথা হয়, তাহলে রাসেলের এই প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের দ্বৈততা মেনে নিতে আপত্তি করা চলে কি?

এডওয়ার্ড লিণ্ড্‌ম্যান বলেছেন, এ যুগের সব সমাজদর্শনকেই মার্কসবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার মূল্যবিচার করা যায়। কারণ মার্কসবাদের প্রতি কোন দর্শনের কি বিচার তার থেকেই সেই সমাজদর্শনের নিজস্ব গতিপথ এবং বক্তব্যটিকে চিনে ফেলা যায়।

ইতিহাসের মার্কসবাদী বিচারে রাসেলের আস্থা নেই। সরল গতিতে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সহজ ইতিহাসের গতিকে তিনি অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। মার্কসীয় অর্থনীতির উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বকে তিনি ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই দুই ভিত্তি যদি বর্জন করা যায় তবে মার্কসবাদে রাসেলগ্রাহ্য আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে মার্কসবাদের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ, বিষৎ সমাজের প্রতি শ্রমিকস্বার্থের অজুহাতে অনাস্থা, শ্রেণীসংগ্রামে ঘৃণাবাদী রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী বিষময় পরিণতি, মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে গণতন্ত্রের চিরবিরোধ এবং সর্বোপরি মার্কসবাদী দর্শনের অন্তর্নিহিত ভ্রান্তিযোগ—এ সবই রাসেলের বিচারে হয় অবৈজ্ঞানিক, নয়তো অপ্রয়োজনীয় এবং পরিহার্য। এককথায় এ বিষয়ে তিনি লিখছেন—

"To my mind, the important matter in politics is the question of power.* Those who have power tend to be unjust to those who have not. This is the argument for democracy and the basic objection to the communist regimes of the present day." (লেখকের নিকট লিখিত পত্রে)।

সাম্প্রতিক যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য সমাজদর্শন ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের যুগ্ম প্রচেষ্টা। এই বিশেষ মতবাদের প্রতি রাসেলের ঘৃণা আরও চরম প্রকৃতির। এদের মতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কোনও বিস্তৃত দর্শনের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে—"Fascism has no philosophy, it has only a psycho-analysis* সাম্যবাদের উপায়ের সঙ্গে রাসেলের প্রধান বিরোধ—মার্কসের সুখী সমাজের নৈরাজ্যবাদী লক্ষ্য সমস্ত আশাবাদী সমাজচিন্তাবিদেরই কাম্য। অথচ ফ্যাসিবাদের সঙ্গে রাসেলের বিরোধ আরও গভীরে। উপায় ও লক্ষ্য, এই দুই প্রসঙ্গে ফ্যাসীবাদের প্রতি তাঁর আক্রমণ সদা উদ্যত।

রাসেলের নিজস্ব সমাজদর্শন মূলতঃ সমাজবাদী—অবশ্য এ সমাজবাদ গণতন্ত্রসম্মত। রাষ্ট্রের প্রতি সন্দেহ তাঁর প্রতি পদে। ব্যক্তির বিকাশের পথে রাষ্ট্রেরচিত অন্তরায় সমূহ রাসেলের বিদ্রোহী মনকে সর্বদাই অশান্ত করে রাখে। অথচ বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা থেকে এ কথাটা আজ

* এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা তাঁর "Power" এবং "Prospects of industrial civilisation" এ পাওয়া যাবে।

* "In praise of Idleness"—Russell.

তিনি বুঝতে পারেন যে অর্থনীতি ও অন্যান্য বার্তাগুলি সাধারণ সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য। এ নিয়ন্ত্রণ অবশ্য সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি সাধনে। অতএব গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকতে পারে রাসেলের সামনে। নৈরাজ্যবাদ ও গিল্ড-সমাজবাদের ছায়া "Roads to Freedom" লেখার সময়ে রাসেলের চিন্তায় রীতিমত প্রকট ছিল। আজ ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে, ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যে তাই রাসেলের রাষ্ট্রচিন্তা আরও সরলীকৃত।

আগামী সমাজের চিত্রাঙ্কনে অতীতের অনেক বিখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক তাঁদের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসেলও তাঁর কল্পনাশক্তি খাটাতে অনিচ্ছুক নন।

কিন্তু রাসেলের ইউটোপিয়া, প্লেটো অথবা মোর থেকে স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত। পূর্বসূরীদের চিত্রাঙ্কণে থাকত সুখী সমাজের চিত্র। রাসেলের পটে যে ছবি আঁকা আছে তার রূপ ভিন্ন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এই মানবসমাজকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে তারই এক অনবদ্য চিত্র পাওয়া যায় রাসেলের "The Scientific outlook" নামক পুস্তকে। এই সমাজে যন্ত্রবিদদের থাকবে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব। নিয়ন্ত্রণ হবে সর্বক্ষেত্রপ্রসারী। মানুষের জন্মগত প্রকৃতিও ধীরে বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রবিদ—প্রভুদের মর্জিমাফিক তৈরি করা হবে। জনতার ব্যবহার নব-মনস্তত্ত্বের সাহায্যে অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এই সরকার।

এই সমাজে হর্ষ হয়ত উপস্থিত থাকবে—কিন্তু আনন্দের ধারা হবে অনুপস্থিত। জ্ঞান থাকবে, প্রেম থাকবেনা। ক্ষমতা থাকবে, প্রফুল্লতা থাকবেনা ("The Scientific Outlook (p p 253-4)।

অর্থাৎ বিজ্ঞানের চরম প্রসার একলা আমাদের আর কিছুতেই দিতে পারেনা সুখী সমাজের উপস্থিতি। এ তথ্য লুই মামফোর্ডের "Technic and Civilisation" গ্রন্থেও স্বীকৃত এবং বহুতথ্যের সমাবেশে প্রমাণিত।

ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে তাহলে সামাজিক প্রগতির কোনও অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই। জড়বাদী মার্কসের অমোঘ ঐতিহাসিক প্রগতির তত্ত্ব, ভাববাদী হেগেলের অবশ্যম্ভাবী মানবমুক্তির তত্ত্ব বা আধুনিক ভাববাদী ক্রোচের infinite progress and in fiaite perfectibility of man তত্ত্বের কোনও সরল সমর্থন ইতিহাসের ইতিকথায় বা দুর্গিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের ভবিতব্যের কল্পনায়। ইতিহাসবাদ, কার্ল পপারের ভাষায়, এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপবিজ্ঞান—তা সে ইতিহাসবাদ প্লেটোর, হেগেলের, মার্কসের, টয়েনবী বা গেপংলার যারই হোক না কেন।

তবে কি ভবিষ্যৎ-চিত্র শুধুমাত্রই নিরাশার দুঃস্বপ্ন মাত্র হয়ে থাকবে? মুক্তির পথ, আশার আলো—সবই কি অলীক স্বপ্নবিলাস?

এর জবাবে রাসেল মানুষের দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে শুভবুদ্ধির প্রসার ও নিছক প্রবৃত্তি-তাড়নায় কৃত কর্মোন্মাদনার প্রতিবন্ধক রচনায় আছে ভবিষ্যতের আশার পথ। প্রবৃত্তি যেমন মানুষের সহজাত তেমন যুক্তিও। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানচেতনার প্রসারে যুক্তি ও শুভ বুদ্ধির প্রসার ঘটতে পারে। এর সঙ্গে যদি আমরা নিজেদের স্বার্থেই ভালবাসা আর সংবেদনশীলতাকে যুক্ত করতে পারি তবে বিজ্ঞান সমাজের অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারবেনা। আশীর্বাদের আলোয় প্রতিভাত হবে মানুষের এই অসাধারণ প্রচেষ্টা—বিজ্ঞান।

Cf : Karl Popper : The Open Society and Its Enemies, Vol. I and II.

আলোচনা

সমালোচনা প্রসঙ্গে

সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে গত আষাঢ় সংখ্যার 'সমকালীনে' স্তুতপা দত্ত সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। তাঁর সংযোজনা থেকেই বোঝা যাবে যে সাহিত্য-সমালোচনা সাহিত্যের সমালোচনা বোঝায় এবং সমালোচনা সাহিত্য অর্থে সাহিত্য-মর্য্যাদা লাভ। যথার্থ সমালোচনার রূপ অধুনা অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং স্তূপও বেড়ে চলেছে। বোধকরি সেইজন্যই সমালোচনা সাহিত্য কথাটার এত চল। অনেক লেখক আছেন যাঁরা কেবল সাহিত্য বা শিল্প সমালোচনাই করে থাকেন। বোধকরি কোনও সাহিত্য সৃষ্টি না করেও সাহিত্যিক খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁদেরই উদ্যোগে এই সমালোচনা সাহিত্য কথাটার উৎপত্তি।

শিল্প মাত্রেই সৃষ্টি হওয়া অবধি মানব মনে বিশ্লেষিত হয়ে চলেছে। এবং এই বিশ্লেষণই এনেছে শিল্পে রূপান্তর। কারণ শিল্পীর মন, সৃষ্টি করেও চোখ নিবদ্ধ করে রাখে এই বিশ্লেষণের উপর। তার কাজ হোল এ সকল অসংখ্য খোসখোরাকী রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করে তোলা, আর প্রকৃত বিশ্লেষক বা সমালোচকের উদ্দেশ্য হল অক্লের রচনায় এই প্রভাব উপলব্ধি করে জনসাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করা। সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই প্রাথমিক সংজ্ঞা ছাড়াও পাণ্ডিত্য-দেখা অধ্যাপকীয় আরও অনেক কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু অধুনা সমালোচনা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারের প্রয়োজন।

প্রথম কথা সমালোচনা-সাহিত্য প্রসঙ্গে। আজকাল অনেক সমালোচনায় সমালোচকের ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে বক্তব্যের বিন্যাস কৌশলে। সেখানে সমালোচনার অনুসৃত পদ্ধতি, ভাষার টেকনিক্ আর ভঙ্গীর জৌলুষ অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচিত বিষয় অপেক্ষা বড় হয়ে ওঠে। এই বিশিষ্ট পদ্ধতির রীতি হল পাণ্ডিত্য দেখানো। একধারে লেখক ও অন্যধারে পাঠককে বুকনির জৌলুষে মাৎ করা, প্রফেসরি বুলি কপচানো, আর উৎসাহ দিয়ে তাদের পিঠ চাপড়ানোর মধ্যে দিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যের রসদ শোনানো।

আর এক শ্রেণীর সমালোচক সমালোচনা অপেক্ষা সমালোচনার গুরুদায়িত্বের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেকে নির্ম্মম ও নির্ভিক সমালোচক প্রতিপন্ন করবার অত্যধিক প্রয়াস পান। অপ্রিয় সত্য বলে সাহিত্যিক বন্ধুদের অপ্রিয়ভাজন হয়েও তাঁরা যে নিজেদের কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করছেন একথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন বারে বারে। কার্য্যতঃ কতখানি তিনি করছেন সে কথা বিচার করার আগে তাঁর এধরণের আত্মপ্রশস্তির মধ্যে আমাদের একটা সন্দেহ জাগে। মনে হয় তিনি পাঠক ও লেখক উভয়কেই জানিয়ে দিতে চান যে যেহেতু তাঁর সমালোচনা হবে নিরপেক্ষ সেই হেতু সকলের কর্ত্তব্য তাঁর সমালোচনাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা। পাঠককে তাঁর সমালোচনার দলে আনা আর লেখকের রচনা পদ্ধতিকে তাঁরই মতানুগ

করা। সাহিত্য জগতে কেবল শিল্প সমালোচনা করেই যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, লেখক ও পাঠকদের মধ্যে এই গায়ে পড়া মধ্যস্থতা করেন তাঁরাই বেশী।

সাহিত্য সমালোচনা ক্রমশঃই ভূয়াবিজ্ঞান কেন্দ্রিক হয়ে চলেছে। মনোবিজ্ঞানের ভূমিকায় "অবচেতন মন" বলে একটি কথা সমালোচনা সাহিত্যে আমদানী করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় যুক্তিকে কেন্দ্র করে এই সমালোচনার পদ্ধতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট অথবা ধোঁয়াটে অভিব্যক্তি আজ অবচেতন মনের ভিতর দিয়ে সমালোচকের কলমে রূপ পরিগ্রহ করছে। সমালোচকদের উস্কানি লাভ করে ক্রমাগত এই ধরণের সাহিত্য এক ক্ষতিকর বৃত্তের (Vicious circle) সৃষ্টি করেছে।

ক্ষতিকর বলা চলে এইজন্য যে শুধু সাহিত্যে দুর্বোধ্যতাই এর একমাত্র দান নয় এরই পেছনে পেছনে জের টেনে চলেছে যৌন সাহিত্য। অবচেতন মনের নামে যৌন বিকৃতির বিভিন্ন চিত্র ও পরিবেশ তুলে ধরা হচ্ছে সাহিত্যের নাম দিয়ে। পাত্র পাত্রীকে কেন্দ্র করে অসভ্যতা যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে সাহিত্যে স্থান পেতে চলেছে। এই ধরণের সাহিত্যিক ও তার সমর্থক সমালোচকের দল ইদানীং এতই বেশী যে কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনাই "শুচিবায়ুগ্রস্ত" আখ্যায় ভূষিত হয়ে যায়। সাহিত্য ব্যবসায়ে লিপ্ত সম্পাদকেরা এ ধরণের লেখার সাহায্য নিয়ে সাময়িক পত্রিকা বাজারে চালু রাখতে একটুকুও লজ্জাবোধ করেন না। কেহ বা এধরনের লেখা প্রকাশ করে আর কেহবা তার অংশ বিশেষ আপাতনিন্দার ছিসাবে সমালোচনা বিভাগে তুলে ধরে কাগজের কাটতির সহায়তা করেছেন এবং তার টিকাটিপ্পনীগুলিও আকর্ষণীয় ভাবে অম্লমধুর করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

এই ধরণের কুসাহিত্য ও কুসাহিত্যিকদের উদ্ভূতি একাধারে তাদের পুস্তকের কাটতির সহায়তা করে এবং সুসাহিত্যিকদের সাহিত্য জগত থেকে বিতাড়নের সহায়তা করে যেমনি অর্থনীতির Gresham's Law। মানবের সু ও কুমনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব যেমন "ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইডে" প্রকাশ পেয়েছে ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সাহিত্য সম্পর্কে উক্তি করা চলে যে মনোবিকৃতি জনিত অশ্লীল সাহিত্য সুসাহিত্যকে বিতাড়িত করে। এমনও দেখা গেছে যে নামকরা সাহিত্যিক বৃন্দও এঁদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁদের এ সম্পর্কে ত্রুটিও এই ধরণের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কোনও ছোট্ট উদ্ভূতি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে টিকা টিপ্পনী সহযোগে প্রকাশ পেয়েছে এই ধরণের সমালোচনা সাহিত্যে; আর বিকারগ্রস্ত সাহিত্যিকেরা ভেবেছেন যে "অমুক" সাহিত্যিকও যদি এই ধরণের লিখতে পারেন তো তাঁরাও এমন কিছু অন্যায় করছেন না।

এরপরেই আনতে হয় বিভিন্ন ইজ্‌মের কথা। deductive, inductive, aesthetic, destructive ইত্যাদি। অনেক সমালোচকই প্রথমতঃ ধরে নেন যে পাঠকবর্গ এই ধরণের ইজম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল। তারপর চলে কথার ফুলঝুরি এই সব ইজমের খেই ধরে। সমালোচনাতে পদ্ধতি নিরূপণ হয় আগে তারপর চলে সমালোচিত বিষয়টিকে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালা। একবার কোনও একটি ইজমের আওতায় ফেলতে পারলেই এদের কাজ হয়ে গেলো।

সেই সঙ্গে আছে রূপকের পাঠোদ্ধার। সম্পূর্ণ নূতন করে সাহিত্যকে তুলে ধরার কৃতিত্ব এখানে সমালোচকের হাতে। সাহিত্যিক রূপক একটা কিছু লিখে স্বচ্ছন্দে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন বাকী কাজটুকু সমালোচকের হাতে তুলে দিয়ে। এরও আছে দুটি দিক। যে কোনও রূপক লেখার উপর ইচ্ছামত কলম চালিয়ে সমালোচক সাহিত্য ক্ষেত্রে হাত পাকান আর সেই সুযোগ নিয়ে অযোগ্য সাহিত্যিকেরাও রূপকের সাহায্যে সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই খুজে নেন। আর একটি হোল এর সাহায্যে মতবাদের প্রচার। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনার সাহায্যে রূপকের অর্থ নির্ণয় করে তার সঙ্গে লাগসই একটি আদর্শের যোগ করে দিলেই হল। খ্যাতনামা মৃত সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের গর্হিত কাজেও অনেক সমালোচককে আসরে নামতে দেখা গেছে।

এর স্বপক্ষে অনেক সমালোচক যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রোপাগ্যাণ্ডা সাহিত্য অন্যায় নয়। কোনও মতবাদের প্রচারকল্পে কথার মনোরম প্রলেপ লাগিয়ে সাহিত্যিক অথবা সমালোচক যদি জনসাধারণের মনকে বিভ্রান্ত করে তোলেন তো মনে যে রাজনৈতিকের কাছে তাহা অন্যায় না হলেও সাহিত্যিকের কাছে পাপ।

তাই আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে। সমালোচনা কোন পথে। তার উদ্দেশ্য বিচ্যুতি ঘটছে কি না। আর তাই যদি হয় তো তার হেতু কি এবং কিই বা তার প্রতিকার। বিদেশী সাহিত্যের Dr. Jhonson এর মতন সমালোচককে বাদ দিলেও বাংলা সাহিত্যে আজ সমালোচনার ধারা দেখা যাবে এমন অবস্থায় এসেছে বা এমন সমালোচনাও হয়েছে যেখানে সকলের মতের বিরুদ্ধে সমালোচক আপনার মত খাড়া করে প্রায় জোর করেই পাঠকের ধারণা উল্টে দেবার প্রচেষ্টা করেছেন। সেখানে সমালোচক সাহিত্যিকের উর্দ্ধে উঠেছেন। এই সকলের মূলে রয়েছে সমালোচক ব্যবসায়ীরা যাঁরা সাহিত্যিক নাম ধারণের জন্য উচ্চাভিলাষী।

শিল্পবিকাশের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন থেকে আরম্ভ করে অধুনা লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ শিল্প ছড়া বা কবিয়ালদের রচনা পর্য্যালোচনা করলে এমন কোনও সমালোচকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না যাঁর জন্যে উন্নততর শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে লোকসাহিত্যে বা লোকশিল্প সম্পর্কে যা কিছু সমালোচনা হয়েছে সেগুলি যে পাঠক বা ভোক্তার উদ্দেশ্যে সেকথা বলাই বাহুল্য। অধিকাংশই লোকশিল্প পুনরুত্থানের বিরুদ্ধবাদী তবু সহরবাসী কি সত্যই সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার আগ্রহ দেখায়নি? লোকশিল্পের বিরূপ সমালোচনার যুক্তি এখন যতই অকাট্য হোক না কেন একথা মানতেই হবে যে তা সত্ত্বেও রসগ্রহণে এই যুক্তিগুলি কোনও কালে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। দেখা গেছে যে রসগ্রহণের অনেক ক্ষেত্রেই একটা অন্ধ দিক আছে যা সমস্ত ছাঁচে ঢালা নিয়মকানুনের বহির্ভূত। এই সমস্ত যুক্তি বিচার করলে বিগত কালের শিল্পসৃষ্টির উপর আধুনিক সমালোচকের অধিকার সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে।

সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে তবে তাকে সমালোচনা-সাহিত্যের পথে অগ্রসর হতে দেওয়া সাহিত্যের অথবা শিল্পের পক্ষে অহিতকর; আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের এই পথে এগিয়ে আসতে হবে। মনে হয় সমালোচনার মান তবেই হবে যথার্থ।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সমাজসমস্যা

সমাজ-ভিত্তি ও সমস্যা

জটিল জীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথ মুক্ত রাখা, ইহাই বর্তমানের সমাজবোধ। আজকের দিনের জীবনের বহুমুখীন দিক ও সমস্যাগুলিকে বস্তুতঃ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই চার পর্যায়ে ভাগ করে নিলে আলোচনার সুবিধা হয়। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রশ্ন থেকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমূহ এই পর্যায়গুলির অন্তর্ভূত। জীবনের সমস্যাগুলি বিচিত্র কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন-প্রবাহ অজস্র ধারায় উচ্ছলিত; কিন্তু আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে অজস্র ধারার প্রতিটি পরস্পর নির্ভরশীল, পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক যুক্ত।

বর্তমান জীবনসমস্যা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে অতীতের দিকে; কয়েক সহস্র বৎসর আগে মানুষের প্রথম সমাজচেতনার উন্মেষের সঙ্গে সভ্যতার সূত্রপাত হল; সেই আদি যুগের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর সমাজজীবন স্থানকালের সীমানা বেয়ে ক্রমবিকাশের পথে বর্তমানের দুরূহ, জটিল, ঐশ্বর্য সম্পন্ন সমাজে পরিণত হয়েছে। সহজ কথায় বলতে পারা যায় বর্তমানে সভ্যতার যে ব্যাপ্তি হয়েছে, অতীতে কোন কালে, কোন স্থানে সভ্যতার এরূপ পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার এমন আভাষ কখনও এবং কোথাও দেখা দেয়নি।

সভ্যতার প্রগতির এক প্রনিধানযোগ্য দিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুধু নয়, ক্রম-বিস্তার। ইতিহাসের প্রথম পাতায় দেখা যায় নীল উপত্যকার সংকীর্ণ স্থান জুড়ে মিশরীয় সভ্য সমাজের ছবি, আর বাকী বিশ্বের বিরাট অংশ জুড়ে সমাজচেতনাবিহীন মানুষের প্রকৃতি জীবনের অন্ধকার যুগ। সমাজজীবনের ক্রম অভিব্যক্তি বিস্তারিত আন্তরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়। ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হল পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, এদিকে পূর্ব ভূমধ্য সাগর অঞ্চলীয় ইজীয়ন্, গ্রীক্ রোমক সভ্যতায়। প্রাচীন সভ্যতার যুগ ছেড়ে মধ্য যুগে এসে পৌঁছুলে দেখি সমাজবদ্ধতার আরও প্রসার ঘটেছে অনেক পরিধি জুড়ে। তারপর সমগ্র এক ভূখণ্ডে নবীন চেতনা নিয়ে ইয়োরোপ জেগে উঠ্‌ল। অপূর্ব প্রাণশক্তির প্রেরণায় নতুন নতুন মহাদেশ সন্ধান করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র পৃথিবীকে স্ব-আওতায় কবলিত করে ইয়োরোপ বর্তমানের এবং বিজ্ঞানের যুগের সূচনা করল।

ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিস্তারের পথে অনেক সভ্যতার উত্থান পতন ঘটেছে; কত বিচিত্র ধরনের সমাজ স্বকীয় শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পের বৈশিষ্ট নিয়ে কত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে ও লোপ পেয়েছে। আমরা দেখেছি প্রতি যুগে প্রতি সভ্যতা কখনও

নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেছে, অর্থাৎ বাহিরের অঞ্চলকে দৈহিক মননশক্তি দিয়ে স্বকীয় অধীনে এনেছে; সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রম বিস্তারের পথে ইহা এক বিশেষ দিক্, কার্ল মার্কস যাকে "ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা" আখ্যা দিয়েছেন। কারণ দেহ মনের শক্তি প্রাচুর্য বাহিরকে আঘাত করতে না পারলে সভ্যতার প্রগতি ব্যাহত হত। দার্শনিক হেগেল আদিযুগ থেকে তাঁর সমকালীন যুগ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে প্রত্যেক যুগে বিশেষ কোন জাতির মাধ্যমে সভ্যতা শীর্ষস্থানীয় রূপে দেখা দেয়, সেই ভাগ্যবান জাতি তখন শৌর্যে, জ্ঞানে, অন্যান্য জাতিদের স্ববশে আনে; এই ভাবে যুগে যুগে সমাজের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা পেয়ে এসেছে। তদানীন্তন পর্যন্ত সভ্যতার গতিবেগ লক্ষ্য করলে হেগেলের মতবাদ যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত তাতে সন্দেহ থাকেনা। হেগেলের অব্যবহিত পরেই কার্ল মার্কসের কাল, কিন্তু সে সময় ইয়োরোপীয় ভাবধারা এত বিচিত্র দিকে প্রবাহিত যে মার্কসীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে হেগেলীয় দর্শন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ল। মার্কসের যুগান্তরকারী সমাজদর্শন বিশ্বের মানুষকে সমর্পণ্যায়ে দেখেছে, কোন ভেদাভেদ স্বীকার করেনি, তবুও তিনি ভেবেছিলেন তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের আরও উত্থান সম্ভব এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপের অনগ্রসর দেশগুলিতে নয়, একমাত্র সম্ভব পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্প, বাণিজ্য, শক্তিতে শ্রেষ্ঠস্থানীয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে। তৎকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে মার্কসের ধারণা যে স্বাভাবিক তা সহজেই অনুমেয়।

হেগেল-মার্কসের সময় থেকে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং কর্মপদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে; এবং এর প্রতিফলন দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে। আজ সম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের রাহুগ্রাস থেকে এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান সমূহ মুক্ত। ইয়োরোপীয় জীবনদর্শনের প্রচণ্ড সংঘাতে তারা নতুন সমাজ প্রেরণার উৎস আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি আজ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং দায়িত্বে সচেতন হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক, আবহমান কাল থেকে সভ্যতার সুখ, সুবিধা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি সুফলগুলি বিশেষ এক মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভোগে সীমাবদ্ধ ছিল; রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, তারপর ছিল ধনিক শ্রেণী; আর বাকী বিশাল অংশ সভ্যতার সমুদয় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, ভারবাহী মাত্র ছিল। পূর্ববর্তী বিভিন্ন সভ্যতার শিল্প, সংস্কৃতির যে সকল নিদর্শন তাদের স্মৃতি বহন করে এনেছে, আমরা জেনেছি সেই সব জৌলুস ও সমারোহের পটভূমিকায় রয়েছে দাসত্বপ্রথা, কত উৎপীড়ন, অগণিত নরনারীকে ন্যায় সঙ্গত জীবনযাত্রার অধিকার থেকে নিষ্ঠুর বঞ্চনা। আজ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখবার দায়িত্ব বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং কাম্য নয়; ভারসাম্য রক্ষা কেবলমাত্র সম্ভব যখন দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সমভাবে অর্পিত হবে সকল মানুষের মধ্যে।

আজ ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য নিজের দেশের সংকীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের সীমারেখা ক্রমশঃ মিলনের এবং সহযোগিতার সীমা রেখায় রূপায়িত হচ্ছে; আজকের মানুষের নিবিড় যোগসূত্র সারা পৃথিবীর সঙ্গে; এই যোগসূত্রের শৈথিল্য সভ্যতাকে সংকটের মুখে তুলে ধরবে, সমাজজীবন বিপন্ন করবে। এই সত্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার এবং জাতীয়তাবোধকে রূপান্তরিত করার সমস্যা আজ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। এতদ্‌সঙ্গে সমস্যা সমাধানের প্রকাণ্ড রাজপথের প্রবেশদ্বার শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক উন্মুক্ত করার সংকেতও দেখা দিয়েছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিস্তার গণতন্ত্রবাদের উত্তরোত্তর ব্যাপকতম প্রতিষ্ঠারই নামান্তর। সমস্যা সমাধানের অগ্রগতির মান নির্ণীত হবে গণতন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন পূর্বক গণতন্ত্রের আদর্শ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্যকরী অনুশীলনের উপর। একমাত্র গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির যথার্থ স্বরূপ এবং তাদের পরস্পর সম্পর্কের তারতম্য নির্ভুল ভাবে প্রতীয়মান হবে। আদর্শ যদি বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন হয়, তবে সে আদর্শের ব্যর্থতা অনিবার্য। মানুষের চিন্তা এবং কর্ম্ম যখন জীবনের বৈচিত্র্যের মাঝে সমন্বয় ও সংহতি বিধানে অপারগ হয়েছে তখন সভ্যতা পতনোন্মুখ হয়েছে। মানুষের চিন্তা এবং কর্ম্ম হয়ত বিশেষ বিশেষ দিকে উৎকর্ষ লাভ করেছে, সেই অবস্থায় আবার অন্য বিশেষ বিশেষ দিকে চিন্তায় এবং কর্ম্মে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে; এই সামঞ্জস্যহীনতা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে ও সভ্যতার বিপর্যয় আনে।

প্রাচীন সভ্য সমাজগুলি শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে যে উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, তাদের নিদর্শনসমূহ আমাদের মধ্যে অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করে এবং আমরা প্রতিপদে অনুভব করেছি প্রাচীনতার মোহের আকর্ষণ। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে কী রূপ প্রবলভাবে বিদ্যমান। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রাচীনতার প্রতি আকর্ষণ, ইহা আমাদের ভাবাবেগ মাত্র; যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। তেমনি আবার অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুনের মোহগ্রস্ত হলে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দুরাশায় পরিণত হবে। এক কথায় ঐতিহ্যের সহিত সমন্বয় ও সংহতি বিধান বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের বিশেষ এক অঙ্গ। বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন যেমন সত্য তেমনি সত্য মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিস্তার। সভ্যতা লোপ পেয়েছে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়নি, স্বল্পাধিক প্রভাব রেখে দিয়েছে পরবর্তী সভ্যতায়; এই ভাবে ক্রম বিবর্তমানের অমোঘ নিয়মে সমাজজীবন বর্ত্তমানে বিশ্বমানবিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বমানবিকতা বোধ বর্ত্তমান যুগের অপরিহার্য ধর্ম্ম, গণতান্ত্রিক আদর্শপ্রণোদিত না হলে এই বোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার কী ভয়াবহ পরিণাম বর্তমানকালে আমরা তার সাক্ষী রয়েছি। নাজী ফ্যাসিবাদ এবং একনায়কত্বের আশ্রয়ী হয়ে জার্ম্মাণ, ইটালীয়, এবং জাপানী জাতি শুধু যে নিজেদের সর্বনাশ আমন্ত্রণ করেছিল তা নয়, বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছিল।

গণতান্ত্রিকতা শুধু যে আদর্শ অতএব উচ্চস্তরের এবং দূরের বস্তু, ঠিক তা নয়; মহান্

আদর্শ সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহা আবার দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্র থেকে সামান্যতম সামাজিক গণ্ডী পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিকতার ব্যাপকতম চর্চ্চা করতে হবে। মহৎ আদর্শের ভাবাবেগে সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে বিপ্লব সংঘটিত করেও আশু ফল লাভ হয় না, সেই আদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণরূপ দেওয়া যায় না। তার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান যুগের পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছি। হিংসার পথ যে আজকের পৃথিবীতে মারাত্মক, আণবিক ও হাইড্রোজেন শক্তির উদ্ভবে এ বোধ জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ফিরিয়েছে। গণতান্ত্রিকতা নিত্য প্রয়োজনীয় একান্ত নিজস্ব বিষয়, সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত স্বাভাবিক গুণের মত ইহাকেও সহজভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে। আদর্শের সঙ্গে এরূপ সহজ ও অনায়াস আত্মীয়তা স্থাপন অসীম ধৈর্যসাপেক্ষ, ইহা কামনা করে সকল মানুষের সহযোগিতা, ইহার দাবী সময় ও ঘটনার দ্রুত গতির সহিত সংগতি রেখে প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলি পরস্পর মিশিয়ে রয়েছে; শিল্পজাত পণ্যের মত ওজনদণ্ডে ইহাদের পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট হয়না, পৃথক করা যায় না, এবং মূল্যও স্থিরীকৃত হয় না। যে কোন দিককে অবহেলা করলে, অন্য দিকগুলির প্রতি অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইয়োরোপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকে বেশী মাত্রায় আধিক্য দেখিয়েছে, রাষ্ট্র সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও তাদের রাষ্ট্রকে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের অন্তরায় রূপে পরিণত করেছে। ফলতঃ জীবন সমস্যায় সমন্বয় ও সংহতি বিধানে অপারগ হয়ে বারবার অশান্তিময় বিপর্যয় এনেছে। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলি হৃদয় বৃত্তির দিক। বিশ্বমানবিকতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মানুষের মন। "শিল্পীকরণ পাপ", ধনতান্ত্রিকতার হৃদয়বিহীন পরিবেশে গান্ধীজীর এই উক্তির মর্ম্ম অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। ইয়োরোপীয় জীবন দর্শনের এই হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং বিশ্বের মানুষকে এ বিষয়ে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্ম্মপন্থা ও সংগঠনের প্রকৃত মূল্য ও স্বরূপ নির্ণয় নির্ভর করছে ব্যক্তি বিশেষের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও অধিকার কতখানি কার্যকরীভাবে স্বীকৃত তার উপর।

বর্ত্তমান জগতের সমস্যাগুলি অবশ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্করণে, ভারতবর্ষে বিদ্যমান; কারণ ভারতবর্ষ আয়তনে এবং লোক সংখ্যায় বিশাল, বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন ভাষার, এবং চিন্তাধারার বৈচিত্র্যের সমাবেশ এখানে। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সহিত তারতের প্রাচীন সভ্যতার পার্থক্য এই যে এখানে প্রাচীন সভ্যতা লোপ পায়নি; ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় জীবন যাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে; প্রাচীন সভ্যতা আমাদের দেশে কেবলমাত্র স্মৃতিতে পর্যবসিত নয় ঐতিহ্য বর্ত্তমান জীবনের বিশেষ অঙ্গ রূপে বিদ্যমান। ভারতের বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্যের রমাঁ রলাঁ প্রমুখ বহু মনীষীদের আকৃষ্ট করেছে। আমেরিকার মত পুরাতনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে একেবারে নতুন ভাবে জীবন যাত্রা সুরু করা আমাদের

দেশে আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। ভারতের সমস্যা যে শুধু সস্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারপ্রাপ্ত এক স্বাধীন দেশের সমস্যা তা নয়; ভয়াবহ দারিদ্র এবং শিক্ষাহীনতা দূর করে জীবন যাত্রার মান অন্যান্য অগ্রগামী দেশসমূহের সমপর্যায়ে উন্নত করার সমস্যা রয়েছেই তার সঙ্গে ঐতিহ্যের সহিত বর্ত্তমান জীবনসমস্যার কালোপযোগী সমন্বয় ও সংহতি বিধানে ভারতীয় সমস্যায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ইয়োরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিশেষ মনোসন্নিবেশ পূর্ব্বক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নে ঔদাসীন্য দেখিয়ে স্বীয় সমাজজীবনকে জটিল করে তুলেছে, একথা যদি সত্য হয় তাহলে ইহাও সত্য যে, কেবল ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত প্রাচ্য জীবনদর্শন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নে বিভোর হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে অবহেলা করে স্বীয় সমাজজীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। প্রাচ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি এখানে গণতন্ত্রের অনুশীলন হয় নি; প্রাচ্য ঐতিহ্যে গণতন্ত্রবোধের অভাব জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্যকে জয়ী করেছে। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণা প্রাচ্যে সস্ত জাগরিত। কাজেই জীবনসমস্যা এখানে অপেক্ষাকৃত প্রবল হলেও পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা প্রাচ্য সমস্যা তথা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সম্যক সহায়তা করবে। রাষ্ট্র থেকে ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন পর্য্যন্ত, সমাজের প্রতি সংগঠনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ সহযোগিতার মহামিলনে রূপান্তরিত হবে।

ব্রজেন্দ্রগোপাল সেন গুপ্ত

বেতার-নাটক-সিনেমা

'অপরাজিত'র চিত্ররূপ

রঙ্গমঞ্চের নাটক ও চলচ্চিত্রের মধ্যে যে বেশ একটা পার্থক্য আছে একথা ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখে মনে হয় না। নাটকে দেখানোর সুযোগ কম, কয়েকটা দৃশ্যের সীমার মধ্যে নাটককে খাড়া করতে হয় বলে সেখানে সংলাপের ভূমিকা অনেকখানি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের মতই একটি কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংলাপের প্রাধান্য বেশ সঙ্কুচিত। চলচ্চিত্র মূলতঃ দেখার ব্যাপার, শোনাটা সেখানে গৌণ। 'টকি'র মধ্যে জনসাধারণকে আশ্চর্য্য করার ব্যাপার যতই থাক না কেন, তাকে আসল বলে মেনে নিলে ছবি আশ্চর্য রকম ব্যর্থ হতে বাধ্য। চলচ্চিত্রের মধ্যে যদি কোন আর্ট থাকে, তা ক্যামেরার ওপর প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। অবশ্য আমি ভেক্টিবাজীর কথা বলছি না—যা এখন হলিউডের প্রধান অবলম্বন। বোম্বাই বর্ত্তমানে এদিক দিয়ে হলিউডের অনুসরণ করছে। আমার ধারণা, 'হেলেন অব্ ট্রয়'জাতীয় ছবি যত কম হয় ততই চলচ্চিত্রের পক্ষে মঙ্গল। কারণ ওসব ছবি দেখে মনে হয় চলচ্চিত্র আর্ট নয়, সার্কাসেরই হেরফের।

আসলে একটা ভালো ছবি করতে গিয়ে যেমন দরকার হয় না জমকালো গল্প আর চোখা চোখা সংলাপ, তেমনি ক্যামেরার কারসাজিও একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। ছবি ভাল হয় ট্রিটমেণ্টের গুণে। চলচ্চিত্রের আর্টের ভালমন্দ এই ট্রিটমেণ্টের ওপরই নির্ভর করে। তার মানেই গল্প বলা। চলচ্চিত্রে গল্প কীভাবে বলতে হয়, এ তথ্য যিনি জানেন না তাঁর পক্ষে ফিল্ম ডিরেক্টর না হয়ে হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট হওয়াই উচিত। একথা অধিকাংশ ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সম্পর্কেই সত্য। যে দুচারজনকে এর বাইরে ফেলা যায় তাঁদের মধ্যে বিমল রায় একজন। একটা রীতিমত দুর্বল গল্প থেকে 'দো বিঘা জমিনে'র মত প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরি করা প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

কিন্তু সত্যজিৎ রায় বিমল রায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালী'-পরিচালকের জীবনের অনন্যসাধারণ কীর্তি। 'অপরাজিত'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ। অধিকাংশ ভারতীয় চিত্র-নির্মাতার মধ্যে যে ফিল্ম সেন্সের অভাব দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছি, সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে তা পুরোমাত্রায় রয়েছে। শ্রীরায়ের সাফল্যের চাবিকাঠিও এইখানে। এর ফলেই 'অপরাজিত' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পমুহেরপর্যায়ে উঠে গেছে।

যে-কোন একটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে কী থাকে? একটা ঘটনাবহুল অবাস্তব ফরমুলায় ফেলা কাহিনী, তরুণ-বয়সী নায়ক-নায়িকার অংশই যেখানে বেশি, হিন্দী ছবি হলে ব্যায়বহুল সেট, আর বাংলা হলে সংলাপসর্বস্ব, বেশ কয়েকখানা গান যার ইণ্টারলিউড মিউজিক তৈরী করতে গিয়ে সুরকাররা প্রায়ই সস্তা ইউরোপীয় রেকর্ডের সুর আত্মসাৎ করেন এবং এমন জোরালো সিচুয়েশন মিউজিক জুড়ে দেন, যা শুনে তাঁদের সুরবোধ ও নাটাবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বোম্বাই ও বাংলায় কয়েকটি ষ্ট্যামার গার্ল আছে যাদের প্রযোজক ও পরিচালকরা মোটা টাকার বিনিময়ে চলচ্চিত্রে যথেচ্ছ ভূমিকায় ব্যবহার করেন। কুরুচিপূর্ণ পোষ্টার ও নানা ধরণের বিজ্ঞাপনের

যারা এঁরা নায়ক নায়িকার নাম ও চেহারা এমনভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন, যার ফলে এরা অন্তত তিন চার বছর দর্শকবৃন্দের মনে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। যে-কোন একজোড়া নায়ক নায়িকা ছবিতে থাকলে সে-ছবি নির্ঘাৎ হিট। এই সব ছবির পরিচালকদের যদি বিন্দুমাত্র শিল্পবোধ থাকত, তাহলে তাঁরা নিজেদের অপকর্ম প্রত্যক্ষ করে লজ্জায় মুখ ঢাকতেন। এর সব কিছুই বর্জন করে সত্যজিৎ রায় এমন শিল্প সৃষ্টি করেছেন যা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে পৃথিবীর নাগরিকত্ব দান করেছে।

সবদিক দিয়ে অ-ভারতীয় ছবি বোম্বাই-এ বেশি তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু তবু একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রেই ভারতীয় জীবনের ব্যাপক ও নিখুঁত রূপ অনুপস্থিত। সত্যজিৎ রায়ের এ আর এক কৃতিত্ব। 'পথের পাঁচালী' যেমন, তেমনি 'অপরাজিত'ও পুরোপুরি ভারতীয় ছবি।

শিল্প সৃষ্টি হিসেবে, আমি মনে করি, 'পথের পাঁচালী'র চেয়ে 'অপরাজিত' আরো পরিণত। যাঁরা বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' পড়েছেন, তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' দেখে হয়ত কিঞ্চিৎ হতাশ হবেন। শ্রীরায় 'অপরাজিত' বইয়ের প্রথমাংশ অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। মায়ের মৃত্যুতে অপুর জীবনের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং 'অপরাজিত' ছবিও এখানে শেষ হয়েছে। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' ঘটনাবহুল উপন্যাস। তা থেকে ঘটনা বাছাই করে সত্যজিৎ রায় বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে মূল গল্পের যে অংশটুকু উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন চমক নেই, কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনাও নেই। নিতান্ত সরল ঘরোয়া পল্লীজীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। কিন্তু পরিচালকের কৃতিত্বে এই কাহিনীর মধ্যে অসাধারণত্বের ছোঁয়া লেগেছে। ছবিতে সংলাপ অত্যন্ত কম, কিন্তু তবু প্রত্যেকটি চরিত্র উজ্জ্বল। তাদের হাবভাব, তাদের অ্যাক্সানেই তারা দর্শকের মনে দাগ কেটেছে। ছবিতে সংলাপ না থাকলেও যে ছবি বুঝতে অসুবিধা হত তা মনে হয় না। এইখানেই সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে বড় জিৎ।

অভিনয়ে কার নাম করব? প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশে সহজ, সাবলীল ও চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। সর্বজয়াকে দেখে যেমন গ্রামের বধূ বলে মনে হয়, তেমনি ন-দশ বছরের অপুর ক্রিয়াকলাপও অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য ভারতীয় ছবিতে ঐ বয়সের ছেলেদের মুখে অত্যন্ত পাকাপাকা কথা জুড়ে দেওয়া হয়।

সঙ্গীতাংশে চমক-লাগানো কোন কিছু নেই, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী সার্থক সঙ্গীত যোজনার জন্যে শ্রীরবিশঙ্কর কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

বাণী দত্ত

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

বাংলা দেশ হুজুগের দেশ। যে-কোন একটা হুজুগে মেতে উঠতে বাঙালী অদ্বিতীয়। অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ এবং কলেজী তরুণতরুণীদের ধ্যান-জ্ঞান এখন সিনেমা। কিন্তু যাঁরা নিজেদের কালচার্ড বলে মনে করেন তাঁরা আবার মেতেছেন সংস্কৃতি নিয়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত নামের সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ গড়ে এঁরা সংস্কৃতির চর্চা করছেন। নামের বাহার কত, কত কাব্যি। সব একেকটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ। এই সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ বা সংস্কৃতি কেন্দ্রের নাম প্রায়ই বাংলা দৈনিক পত্রিকা খুললে দেখতে পাবেন। অমুক বিখ্যাত ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে তার খবর, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের অমুক নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়েছে তার নির্জলা প্রশংসা।

এই সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পরিচালকরা নিজেদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা না হলে দেশের সংস্কৃতি রসাতলে যেত। নাচ-গানের চর্চা করে তাঁরা দেশের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া, তাঁরা লোকশিল্পের কত বড় পৃষ্ঠপোষক। যামিনী রায়ের আর্টে লোকশিল্পের ধারার সন্ধান পাওয়া যায় বলেই না তাঁরা তাঁর এত ভক্ত।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই সব আত্মনিযুক্ত সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বদ্ধ জলা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এঁদের বেশি টানাহ্যাঁচড়া। কারণ নিজেরা নতুন কিছু সৃজনে অক্ষম। তাই নৃত্যনাট্য অভিনয় করতে গেলেই সেই চিত্রাঙ্গদা-শ্যামা-চণ্ডালিকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হয়। আর সেই একই কতকগুলো চেনা মেয়ের মুখ, যাদের বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বহিরঙ্গে সংস্কৃতির প্রলেপ থাকলেও আসলে সেগুলো ব্যবসার মাধ্যম। ব্যবসা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে। তারপর মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নৃত্যনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে মোটা টাকা ঘরে আসে। বিল্ডিং ফাণ্ড বা আর কোন ফাণ্ডের নামেও ত টাকা তোলা যেতে পারে।

এদের পরস্পরের মধ্যে রেষারেষিও খুব বেশি। শান্তিনিকেতনের ছাপওলাদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের ভুলভ্রান্তি নিয়ে কলহ, আর বাকীদের মধ্যে কে কাকে টেক্কা দিয়ে সুনাম অর্জন করতে পারে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। এগুলো যদি রাতারাতি উঠে যায় তবে কি দেশের কোন ক্ষতি হবে? এক কথায় এর উত্তর—না। তবে রবীন্দ্রজয়ন্তীওলারা বিপদে পড়বেন সাতদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে।

সিদ্ধার্থ সেন

গ্রন্থপরিচয়

পথের সন্ধানে : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস। পাঁচ টাকা।

শিল্পের জন্যে শিল্পের নীতি আজ বরবাদ হয়ে গেছে। যুগ বদলেছে, মানুষের মন ও সেই সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের কোন বিবেকবান শিল্পী সাহিত্যিকই আর একটা কাল্পনিক গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করতে রাজী নন। একদিকে যেমন বিজ্ঞান সাহিত্যের এলাকায় প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজভাবনা ছাড়া সাহিত্য অচল। আধুনিক সংঘাতজর্জর মানুষ একালের সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। আধুনিক মানুষের জীবন ও মন শুধু যে জটিল হয়ে উঠেছে তাই নয়, নানা অসুস্থতা, নানা ভ্রান্তি তাকে গ্রাস করেছে। পশ্চিমী লেখকদের সাম্প্রতিক রচনায় এইসব মানুষের ছায়া সুস্পষ্ট।

বাংলা দেশ রণাঙ্গণে পরিণত না হলেও যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা আমাদের কম পোয়াতে হয়নি। যুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমরা কম দুঃখ কষ্ট ভোগ করিনি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ত বটেই। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সমাজের কাঠামো একেবারে ভেঙে গেছে। এরজন্যে দুঃখে করে লাভ নেই। সমাজ বদল হবেই, সমাজ যে ডায়নামিক্‌। যুদ্ধের ফলে এ পরিবর্তন না ঘটলে অন্য উপায়ে ঘটত। কিন্তু নতুন সমাজ গড়ে উঠছে কই? এখনকার বাংলা দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় 'যোবি খুসে'র যুগ চলেছে। যার যা খুসি করে যাচ্ছে। বলবার কেউ নেই। সর্বক্ষেত্রেই এই অবস্থা।

রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। সংস্কৃতির আলো নিভু নিভু। আদর্শবাদী লেখক নেই। লেখকরা এখন কাঞ্চনবাদী। লক্ষ্য এঁদের অর্থ, উপায় সাহিত্য। মানুষের ওপর যে দরদ, যে বিশ্বাস থাকলে মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব তা এঁদের মধ্যে অনুপস্থিত।

যে-কারণেই হ'ক, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের সন্ধানে' পড়লে মনে হয় এক অন্য জগতে এসে পড়েছি। এখানে সব মানুষ সৎ, যারা নয় তাদের পরিবর্তন ঘটে। 'পথের সন্ধানে' স্পষ্টতই গঠনমূলক উপন্যাস। সুতরাং সাহিত্য বিচারের প্রচলিত রীতিতে এর বিচার না করাই ভাল। লেখক পুরোপুরি আদর্শবাদী। তার ছাপ উপন্যাসের সর্বত্র সুস্পষ্ট। গ্রামের পটভূমিতে উপন্যাস ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

জনসাধারণের নিকট শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়ের পরিচিতি রাজনীতিক হিসেবে। তিনি যে আবার সাহিত্যিকও এ খবর হয়ত অনেকে জানেন না। 'পথের সন্ধানে' পড়ে বেশ বোঝা যায়, রাজনীতির অন্তরালে তিনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তা লালন করেছেন এবং দীর্ঘদিন সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

হীরেন বসু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড়, কলিকাতা-১৩, হইতে প্রকাশিত ও ২ [illegible] লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

Your Constructions are
CHEAPER — QUICKER — SAFER
WITH

MAXWELD
GUARANTEED
FABRIC

It is made from Hard Drawn Steel Wire 37/42 Tons per sq. inch Tensile Strength complying in all respects with B. S. S. No. 785
It is electrically welded at all points of intersection.
It complies with B. S. S. 1221 Part 1945.
Managing Director : **Sri M. K. Bhimani.**

Calcutta Branch :	Sole Importers :	Madras Agents :
Alsales Ltd.,	**ALSALES LTD.,**	**The Bombay Co. Ltd.,**
30, Bentinck St.,	9, Wallace Street,	P.O. Box No. 109,
CALCUTTA.	Fort, BOMBAY.	169, Broadway,

Tele { Ph : 23-1070 / Gram : VAHLOVATAN

Tele { Ph : 26-2139 / Gram : ALSALES / Fac. Ph : 86438